ADHUNIK BHARATIO BHASA

BA [Bengali]

Second Semester

[Bengali Edition]

Directorate of Distance Education

TRIPURA UNIVERSITY

Reviewer

Dr. Munmun Gangopadhyay

Associate Professor, Department of Bengali, Rabindra Bharati University

Author

Mr. Supriyo Das, DDE, RBU

Copyright © Reserved, 2016

Books are developed, printed and published on behalf of **Directorate of Distance Education, Tripura University** by Vikas Publishing House Pvt. Ltd.

All rights reserved. No part of this publication which is material, protected by this copyright notice may not be reproduced or transmitted or utilized or stored in any form of by any means now known or hereinafter invented, electronic, digital or mechanical, including photocopying, scanning, recording or by any information storage or retrieval system, without prior written permission from the DDE, Tripura University & Publisher.

Information contained in this book has been published by VIKAS® Publishing House Pvt. Ltd. and has been obtained by its Authors from sources believed to be reliable and are correct to the best of their knowledge. However, the Publisher and its Authors shall in no event be liable for any errors, omissions or damages arising out of use of this information and specifically disclaim any implied warranties or merchantability or fitness for any particular use.

Vikas® is the registered trademark of Vikas® Publishing House Pvt. Ltd.

VIKAS® PUBLISHING HOUSE PVT. LTD.
E-28, Sector-8, Noida - 201301 (UP)
Phone: 0120-4078900 • Fax: 0120-4078999
Regd. Office: 7361, Ravindra Mansion, Ram Nagar, New Delhi – 110 055
• Website: www.vikaspublishing.com • Email: helpline@vikaspublishing.com

সিলেবাস বই - ম্যাপিং টেবিল

সিলেবাস

প্রথম একক : একালের কবিতা সঞ্চয়ন **(পৃষ্ঠা 1-28)**

১.১ তিমিরহননের গান

১.২ রবীন্দ্রনাথের প্রতি

১.৩ এক ঝাঁক পায়রা

১.৪ আমার ভারতবর্ষ

১.৫ অবনী বাড়ি আছো

১.৫ কেউ কথা রাখেনি

দ্বিতীয় একক : ভাষা পাঠ সঞ্চয়ন **(পৃষ্ঠা 29 - 64)**

২.১ শিক্ষার বাহন

২.২ বাংলার সংস্কৃতি

২.৩ মানবসভ্যতা ও বিজ্ঞান

২.৪ বাংলার নবজাগরণের সূচনা

তৃতীয় একক : ভাষা পাঠ সঞ্চয়ন (গল্প) **(পৃষ্ঠা 65 - 126)**

৩.১ ছুটি

৩.২ দানপ্রতিদান

৩.৩ পুঁইমাচা

৩.৪ লম্বকর্ণ

চতুর্থ একক : পরিভাষা **(পৃষ্ঠা 127 - 130)**

সূচীপত্র

টিপ্পনী

প্রথম একক : একালের কবিতা সঞ্চয়ন (পৃষ্ঠা 1-28)

১.১ তিমিরহননের গান - জীবনান্দ দাশ

১.২ রবীন্দ্রনাথের প্রতি - বুদ্ধদেব বসু

১.৩ এক ঝাঁক পায়রা - বিমলচন্দ্র ঘোষ

১.৪ আমার ভারতবর্ষ - বীরেন্দ্র ছট্টোপাধ্যায়

১.৫ অবনী বাড়ি আছো - শক্তি চট্টোপাধ্যায়

১.৫ কেউ কথা রাখেনি - সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

দ্বিতীয় একক : ভাষা পাঠ সঞ্চয়ন (পৃষ্ঠা 29 - 64)

২.১ শিক্ষার বাহন - রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর

২.২ বাংলার সংস্কৃতি - দীনেশচন্দ্র সেন

২.৩ মানবসভ্যতা ও বিজ্ঞান - প্রিয়দারঞ্জন রায়

২.৪ বাংলার নবজাগরণের সূচনা - কাজি আবদুল ওদুদ

তৃতীয় একক : ভাষা পাঠ সঞ্চয়ন (গল্প) (পৃষ্ঠা 65 - 126)

৩.১ ছুটি - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩.২ দানপ্রতিদান - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩.৩ পুঁইমাচা - বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

৩.৪ লম্বকর্ণ - পরশুরাম

চতুর্থ একক : পরিভাষা (পৃষ্ঠা 127 - 130)

ভূমিকা

টিপ্পনী

আধুনিক ভারতীয় ভাষা গুলির মধ্যে বাংলা আন্যতম উন্মত ভাষা। প্রাচীন বাংলা অর্থাৎ চর্যাপদের যুগ থেকে মধ্যযুগের বাংলার স্তর পেরিয়ে উন্মত ও উৎকর্ষাত্ম এই বাংলা ভাষার বর্তমান বৈচিত্রময় প্রকাশ। 'স্নাতক বাংলা' মড়িউলটি চারটি (৪) এককে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথম এককে রবীন্দ্র পরবর্তী কবি জীবনানন্দ দাশ, বুদ্ধদেব বসু, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় প্রমূখ লেখকদের নির্বাচিত কবিতা সংযোজিত হয়েছে। রবীন্দ্র উত্তর যুগের প্রতিভাধর কবিদের বিখ্যাত কবিতা সংকলনের পাশাপাশি তার পাঠ বিশ্লেষণ করে পাঠক ও ছাত্র - ছাত্রীদের উপকৃত করার প্রচেষ্টা আছে এই মডিউলে।

দ্বিতীয় এককে রবীন্দ্রনাথ ও পরবর্তী তিনজন প্রতিভাধর প্রাবন্ধিকের প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে। তৃতীয় এককে বরবীন্দনাথের 'ছুটি' দান-প্রতিদান' ছাড়াও আরো বিখ্যাত তিনজন গল্পকারের গল্প স্থান পেয়েছে এখানে। বিভূতিভূষন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পুঁইমাচা' ও পরশুরামের 'লম্বকর্ণ' দুই ভিন্নধর্মী গল্প সংকলিত হয়েছে এই এককে। চতুর্থ এককে 'পরিভাষা' বিষয়টি স্থান পেয়েছে যা দ্রুত পরিবর্তনশীল পৃথিবীতে যেকোন ভাষা সমানগতিতে চলতে গেলে পরিভাষা আবশ্যক, সাহিত্য, শিল্প - সমাজ - বিজ্ঞান - দর্শনের বিশেষ শব্দগুলির সঠিক পরিভাষা প্রতিটি ভাষার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। বাংলা স্নাতক স্তরের দিকে লক্ষ্য রেখে 'আধুনিক ভারতীয় ভাষা বাংলা' মডিউলটি রচিত।

তিমিরহননের গান

জীবনানন্দ দাশ

টিপ্পনী

কোন হ্রদে
কোথাও নদীর ঢেউয়ে
কোনো এক সমুদ্রের জলে
পরস্পরেরর সাথে দু-দন্ড জলের মতো মিশে
সেই এক ভোরবেলা শতাব্দীর সূর্যের নিকটে
আমাদের জীবনের আলোড়ন -
হয়তো বা জীবনকে শিখে নিতে চেয়েছিলো।

অন্য এক আকাশের মতো চোখ নিয়ে
আমরা হেসেছি,
আমরা খেলেছি :
স্মরণীয় উত্তরাধিকারে কোনো গ্লানি নেই ভেবে
একদিন ভালোবেসে গেছি।
সেই সব রীতি আজ মৃতের চোখের মতো তবু
তারার আলোর দিকে চেয়ে নিরালোক।
হেমন্তের প্রান্তরের তারার আলোক।
সেই জের টেনে আজো খেলি।
সূর্যালোক নেই - তবু -
সূর্যালোক মনোরম মনে হ'লে হাসি।
স্বতই বিমর্ষ হ'য়ে ভদ্র সাধারণ
চেয়ে দ্যাখে তবু সেই বিষাদের চেয়ে
আরো বেশি কালো কালো ছায়া
লঙ্গরখানার অন্ন খেয়ে
মধ্যবিত্ত মানুষের বেদনার নিরাশার হিসেব ডিঙিয়ে
নর্দমার থেকে শূন্য ও ভারব্রজে উঠে
নর্দমায় নেমে -
ফুটপাত থেকে দূর নিরুত্তর ফুটপাথে গিয়ে
নক্ষত্রের জোৎস্নায় ঘুমাতে বা মরে যেতে জানে।

টিপ্পনী

এরা সব এই পথে;
ওরা সব ওই পথে তবু
মধ্যবিত্তমদির জগতে
আমরা বেদনাহীন - অন্তহীন বেদনার পথে।
কিছুনেই - তবু এই জের টেনে খেলি ;
সূর্যালোক প্রজ্ঞাময় মনে হলে হাসি ;
জীবিত বা মৃত রমণীর মতো ভেবে - অন্ধকারে -
মহানগরীর মৃগনাভি ভালোবাসি,
তিমিরহননে তবু অগ্রসর হ'য়ে
আমরা কি তিমির বিলাসী ?
আমরা তো তিমিরবিনাশী
হতে চাই
আমরা তো তিমির বিনাশী।

লেখক পরিচিতি : জীবনানন্দ দাশ [১৮৯৯ - ১৯৫৪]

জন্ম : বরিশাল জেলায়, পিতা - সত্যানন্দ, মাতা - কুসুমকুমারী দাশ। পিতা বরিশাল শহরের ব্রজমোহন স্কুলে শিক্ষাকতা করতেন। তিনি পৈতৃক ব্রাহ্মধর্মানলম্বী ছিলেন। মা ছিলেন সুশিক্ষিতা এবং কবি। জীবনানন্দ ব্রজমোহন স্কুলে পড়াশুনা করেছেন। ১৯১৫ - ম্যাট্রিকপাশ, ১৯১৭ - আই. এ, ১৯১৯ - ই; রেজি অনার্স সহ বি. এ পাশ (প্রেসিডেন্সি), ১৯২১ - কলকাতা নিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. এ. পাশ। ১৯২২ সালে সিটি পলেজে অধ্যাপনার কাজে যোগদান। ১৯২৯ দিল্লির রামযশ কলেজে যোগদান। ১৯৩৫ - ৪৬ এম. বি. এস কেলেজে যোগদান। দেশভাগ স্বাধীনতার পরে ১৯৫০ - খড়গপুর কললেজে অধ্যাপনার পরে ১৯৫২ বড়িশা কলেজে যোগদান।

রচনা সমগ্র :

প্রথম কাব্যগ্রন্থ - ঝরাপালক - ১৯২৭, ধূসরপান্ডুলিপি ১৯৩৬, বনলতা সেন, মহাপৃথিবী, সাতটি তারার তিমির, রূপসীবাংলা (১৯৫৭) প্রভৃতি, এছাড়া 'কবিতার কথা' নামক প্রবন্ধ গ্রন্থ ছাড়া ও অগ্রন্তিত উপন্যাস, নাটক প্রবন্ধ তিনি রচনা করেছেন।

পাঠপর্যালোচনা :

টিপ্পনী

যথার্থ যুগের অভিজ্ঞতা জীবনানন্দের কবিতায় মূর্ত হয়ে উঠেছে। বিশ শতকের জটিল মন ও মননের এক আশ্চর্য প্রতীক জীবনানন্দ। ড. তপোধর ভট্টাচার্য বলেন -

'জীবনানন্দ' এখন আর ব্যাক্তি নাম নয় কেবল, এই নাম আসলে ক্রম প্রসারশীল এক কিংবদন্তী।'

কবি জীবনানন্দের ব্যাক্তিজীবন, সমাজ পরিবেশ, কালের নখদ্রংধাঘর কাব্যে ব্যাপক প্রভাব আছে যা 'আমার জীবনান্দ' গ্রন্থে হিমবন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় জানালেন -

'..... ব্যাক্তি জীবনের নানা অন্বয়, চাকরি পাওয়া এবং হারানো, শেষে উমেদারি, টাকার জন্য পত্রিকা সম্পাদকের কাছে কাতর প্রার্থনা, বাস্তুচ্যুত হয়ে কোলকাতার অসুখী শহরবাস তো ছিলই, ছিল শনিবারের চিঠি ও সজনীকান্ত দাসের প্রগল্ঙ দংশন, সমালোচনার নামে সাবলাইম ছ্যাবলামি।'

'তিমির হননের গান' কবিতাটি ১৩৫০ সালের পৌষমাসে 'কবিতা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। মন্বন্তর কে পুঁজি করেই এ কবিতার শরীর। এমন এক ইতিহাসের স্মারক এই কবিতায় আর্থ সামাজিক বিপন্নতা, লোভ, লালসার আধিক্য, মানবিকতার নিমঞ্জন সবই অনুমেয়। কবিতাটির শুরুতে হ্রদ, সমুদ্র, নদীর ঢেউয়ে ইতিহাস থেকে বউযোজন দূরে কোন এক সময় জেগে উঠে ছিল জীবনের প্রথম আলোড়ন। সূর্যোদয়ের সেই ব্রাহ্মন মুহূর্তের কথা জীবনানন্দ তুলে আনলেন কবিতায় -

"সেই এক ভোরবেলা শতাব্দীর সূর্যের নিকটে
আমাদের জীবনের আলোড়ন -
হয়তো বা জীবনকে শিখে নিতে চেয়েছিলো।

জল - মাটি - ঢেউ - সূর্যের আলোর মাখামাখিতেই প্রণের স্পন্দন, জীবনের প্রারম্ভেই, জীবন ছিল আলোর অভিসারী। এক আদিম প্রকৃতির কথা পেলাম এখানে। 'তিমির হননের গান' কবিতার মূল বিষয়ের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই বলে মনে হয়, কিন্তু 'তিমির বিনাশী' যে আলো তার অবাধ আনাগোনার সূত্রটি আছে এখানে।

দ্বিতীয় পর্বে কবি এক বাস্তব ইতিহাসের মুখাপেক্ষী, মানুষ তার নৈতিককতাকে প্রতিদিন দলিত করছে, স্বাভাবিক জীবন বোধ এখন কেমন বদলে গেছে। এখন আমরা যেন হেমন্তের ঝরা পাতার মত তেজহীন, জীর্ন, অন্ধকারে নিমজ্জিত হতে হতে তারার আলো ও

টিপ্পনী

আলোহীন মনে হচ্ছে। এতদিনের সেই সব রীতি নীতি সবই -

'সেই সব রীতি আজ মৃতের চোখের মতো তবু -
তারার আলোর দিকে চেয়ে নিরালোক।
হেমন্তের প্রান্তরের তারার আলোক।'

হেমন্তের আলোক মৃতের চোখের আলোর মতোই। এখন কৃত্রিমতা, বিনর পঙ্কে নিমজ্জিত হয়ে সূর্যালোক প্রত্যক্ষন করিনা সূর্যালোক মনোরম মনে হলে আমরা হাসি। এ হাসি কি তবে সেই ব্যাঙের হাসি ? না অন্য কিছু। সূর্যের হাসি আমরা ভুলে গেছি। তাই এক বিদ্রুপাত্মক প্রসঙ্গ তুলে এনে জীবনান্দ বললেনে -

সূর্যালোক নেই - তবু -
সূর্যালোক মনোরম মনে হ'লে হাসি।
স্বতই বিমর্ষ হ'য়ে ভদ্র সাধারণ
চেয়ে দ্যাখো তবু সেই বিষাদের চেয়ে
আরো বেশি কালো - কালো ছায়া

মন্বন্তরের মৃতুর করাল ছায়া চিত্ররূপনিল এ কবিতায়। নবান্নের সেই ট্যানপরা, বুভুক্ষ মানুষের দল যেমন নগরীতে আছড়ে পড়ল, তেমনি জীবনানন্দের 'তিমির হননের গানে' গাঙ্গর খানা, নর্দমা, ওভারব্রিজ প্রভৃতি প্রসঙ্গ তার বাস্তবতাকেই নির্দেশ করে। মানুষ নিজের লাভ, লোভ, ফাঁকিকে আঁকড়ে সেই সব দুর্ভিক্ষ নৈতিকপতনের কথা -

'নাঙ্গরখানার অন্ন খেয়ে
মধ্যবিত্ত মানুষের বেদনার নিরাশার হিসেব ডিঙিয়ে
নর্দমার থেকে শূন্য ওভারব্রিজে উঠে
নর্দমায় নেমে -
ফুটপাত থেকে দূর নিরুত্তর ফুটপাথে গিয়ে
নক্ষত্রের জ্যোৎস্নায় ঘুমাতে বা ম'রে যেতে জানে।

এই কবিতায় দুর্ভিক্ষ করাল ছায়া, মানুষের মৃত্যুর মিছিল শুধু নয় নৈতিকতার পতন কেমন সয়ে গেছে -

'মধ্যবিত্তমদির জগতে
আমরা বেদনাহীন - অন্তহীন বেদনার পথে।'

নিরালোকের কথাই কবিতাটির মুখ্যবিষয় নয়। তিমিরহননের অর্থাৎ তিমির অতিক্রমনের

প্রয়াস আছে এ কবিতায়।

কবিতার অন্তিম স্তবকে উপনীত হলে তিমির বিনাশের কণ্ঠ জেগে ওঠে। জীবনের শুরুতে আমাদের ভিতর যে আলেক প্রবিষ্ট সেই আলের আলো দেখতে পাবে। এমন এক যন্ত্রনা বিদ্ধ অবক্ষয়ের যুগে আমরা যদি প্রত্যয়ী হয়ে- তিমির বিলাসী না হয়ে 'তিমির বিনাশী' হয়ে উঠতে পারি তারই সংশয়ী উক্তি কবির কণ্ঠে -

'আমরা কি তিমির বিলাসী ?
আমরা তো তিমির বিনাশী
হ'তে চাই।
আমরা তো তিমির বিনাশী।'

জীবনান্দের 'তিমির বিনাশী' মনোভাবই কবিতার শেষ পর্যায়ে জাগরুক। কবিতায় মন্বন্তর প্রতিরোধ, মনুষ্যত্বের পতন, মানুষের অসহায় দিক ইতিহাস হয়ে আছে। দীর্ঘ ৪০ পংক্তির কবিতায় কবি চিত্ররূপময় করে তুলেছেন। প্রতিটি স্তবকে শব্দ চয়ন আমাদের বিষয়ে গভীরে গিয়ে চিন্তায় সাহায্য করে। শেষ পংক্তি গুলি সম্পর্কে সংবেদনশীল জীবনানন্দের এক ভাষ্য গড়লেন শ্রদ্ধেয় তপোধীর বাবু -

'এই পঙ্‌ক্তিগুলি পড়ে একটি বিখ্যাত মন্তব্য মনে পড়ে যায়। 'meaning is a communal possibility'- এই কবিতায় একটি সামাজিক প্রতিবেদনই তো উপস্থাপিত করতে চেয়েছেন জীবনানন্দ ; আর মূল সন্দর্ভের মধ্যে অন্তর্বয়ন হিসাবে রয়েছে ব্যক্তিগত অনুভববাহী শব্দ সংকেত।'

আদর্শ প্রশ্নমালা :-

ক. 'তিমিরহননের গান' কবিতাটির নামকরনের সার্থকতা বিচার করো।

খ. মন্বন্তর বিষাদ - নীতিহীনতার যে চিত্র জীবনানন্দ এই কবিতায় ফুটিয়েছেন তা লেখ।

ঘ. 'সেই সব রীতি আজ মৃতের চোখের মতো তবু -
তারার আলোর দিকে চেয়ে নিরালোকে।'
- কোন সব রীতি আজ মৃতের চোখের মতো - ? কোন সময়ের কথা বলা হয়েছে ? কেনই বা এত নিরালোক অর্থাৎ আলোর অভাব ?

টিপ্পনী

টিপ্পনী

রবীন্দ্রনাথের প্রতি

বুদ্ধদেব বসু

টিপ্পনী

তোমারে স্মরণ করি আজ এই দারুন দুর্দিনে
হে বন্ধু হে প্রিয়তম। সভ্যতার শ্মশান - শয্যায়
সংক্রামিত মহামারি মানুষের মর্মে ও মজ্জায় ;
প্রাণলক্ষ্মী নির্বাসিতা। রক্তপায়ী উদ্ধত সঙিনে
সুন্দরেরে বিদ্ধ করে, মৃত্যুবহ পুষ্পকে উজ্জীন
বর্বর রাক্ষস হাঁকে, 'আমি শ্রেষ্ঠ, সবচেয়ে বড়ো।'
দেশে দেশে সমুদ্রের তীরে তীরে কাঁপে থরো থরো
উন্মত্ত জন্তুর মুখে জীবনের সোনার হরিন।

প্রাণ রুদ্ধ, প্রাণ স্তব্ধ। ভারতের স্নিগ্ধ উপকূলে
লুব্ধতার লালা ঝরে। এত দুঃখ, এ দুঃখসহ ঘৃণা -
এ-নরক সহিতে কি পারিতাম, হে বন্ধু, যদি না
লিপ্ত হত রক্তে মোর, বিদ্ধ হত গূঢ় মর্মমূলে
তোমার অক্ষয়মন্ত্র। অন্তরে লভেছি তব বাণী
তাই তো মানি না ভয় জীবনেরই জয় হবে জানি।

লেখক পরিচিতি : বুদ্ধদেব বসু : [১৯০৮ - ১৯৭৪]

জন্ম : কুমিল্লায়, আদিবাড়ি ঢাকা বিক্রমপুর মালাখানগর। তিনে অধ্যাপনার সঙ্গে যুক্ত ছিলে । প্রথমে সুরেন্দ্রনাথ কলেজ তারপর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা ও অধ্যাপক।

তাঁর সৃষ্ট সাহিত্য সম্ভার :

কবিতা ও অনুবাদ :

স্বাগত বিদায়, যে আধার আলোর অধিক, বন্দীর বন্দনা (১৯৩০), দময়ন্তী (১৯৪৩) দ্রৌপদির শাড়ি (১৯৪৮), শীতের প্রার্থনা, বসন্তের উত্তর, মেঘদূত, হোল্ডালিন- এর কবিতা প্রভৃতি।

টিপ্পনী

উপন্যাস, ছোটগল্প ও নাটক :

সাড়া, তিথিভোর, রাত 'রে বৃষ্টি, আয়নার মধ্যে একা, শেষ পাণ্ডুলিপি, শোনপাংশু, ভাসো আমার ভেলা, একটি জীবন ও কয়েকটি মৃত্যু, তপস্বী ও তরঙ্গিনী, কলকাতার ইলেকট্রা প্রভৃতি।

প্রবন্ধ, ভ্রমণ ও স্মৃতিকথা :

কালের প্রতিমা, সাহিত্যচর্চা, সঙ্গ : নিসঙ্গতা : রবীন্দ্রনাথ, জাপানী জর্নাল, দেশান্তর, আমার ছেলেবেলা, An Acre of Green Grass.

পাঠপর্যালোচনা :

কবি প্রেমেন্দ্র মিত্রের সমসাময়িক কবি বুদ্ধদেব বসু। প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতায় সমাজসত্তার প্রাবল্য আর বুদ্ধদেবের কবিতায় আছে ব্যাক্তিসত্তার প্রাধান্য। তিনি একান্ত ভাবে ব্যাক্তিজীবনের কবি হলে ও সমাজ চেতনা বহির্ভূত নয়। আধুনিক কবিদের আর একটি দিন উঠে আসে তা হল রবীন্দ্র প্রভাব। এই প্রভাব কাটান বুদ্ধদেব বসুর ও সমস্যা। বাংলা কবিতায় আধুনিক কাব্য আন্দোলনের পুরোধা পুরুষ বুদ্ধদেব বসু। আজীবন রবীন্দ্রনাথ বিরোধিতা করে নতুন ধারা গঠন যেমন যত্নশীল, তেমনি রবীন্দ্র প্রশস্তি ও ত্যাগ করেননি। আলোচ্য 'রবীন্দ্রনাথের আঁকড়ে ধরা। কবিতা ও প্রেম তাঁর কবিতার প্রধান বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে। স্বাতন্ত্র্যের যুগে দাঁড়িয়ে ও তিনি জানেন -

রবীন্দ্র ঠাকুর শুধু আজি হ'তে শতবর্ষ পরে
কবি-রূপে রহিবেন কুমারীর প্রথম প্রেমিক,
.....

'রবীন্দ্রনাথ' কবিতায় ও রবীন্দ্র স্তুতির সুর -

'..... তবু ছিলে প্রতিযোগিতার
পরেপারে, বিশ্রামে শুভ্রতাময়, যেন তুমি কখনো করোনি
চেষ্টা, কিংবা যেন কলম গিয়েছে ভেসে, তুমি শুধু জল।'

রবীন্দ্রনাথের প্রতি' বুদ্ধদেব বসু রচিত কবিতাটি রচিত কবিতাটি বিশ্বযুদ্ধ উন্মত্ত সমগ্র পৃথিবী, ভারতবর্ষ ও তার আগ্রাসন থেকে বাদ যায়নি, কবি মনে যে প্রতিক্রিয়া তারই প্রতিচ্ছবি এখানে পড়েছে। তবে এ কথা সত্যি সমগ্র ভাতবর্ষ যখন স্বাধীনতা উন্মুখ এবং স্বাধীনতা লাভ, দ্বিখন্ডিত ভারতভূমি। পরপর দুটি মহাসমর তার কোন গভীর প্রভাব অর্থাৎ

সুস্পষ্ট ছবি তার কবিতায় দেখা যায় না। বুদ্ধদেব বসু যতই বলুন না কেন কবির ভালো কবিতা লেখা ছাড়া আর কোন উদ্দেশ্য নেই বা 'শিল্পরচনার আর সমাজ রচনার জগৎ সম্পূর্নই স্বতন্ত্র।' কবি তার রচনার ক্ষেত্রে তাকে বারবার বাস্তবের সম্মুখীন হতে হয়েছে। বর্ণ-বিদ্বেষী অমানবিকতা ময় আফ্রিকার কালো মানুষকে সহানুভূতি জানিয়ে সমসাময়িক কবিদের মতো তিনি 'ছায়াচ্ছন্ন হে আফ্রিকা' লিখলেন, তিনি নাগরিক কবি তাই নগর চেতনা তার কবিতা থেকে বিযুক্ত নয়। 'রবীন্দ্রনাথের প্রতি' কবিতাই যে দুর্দিনে কবি গুরুকে এবং তার অমীয়বানী স্মরণ করেছেন তা এক ক্রান্তি কালের সময়।

বুদ্ধদেব বসু চোখের সামনে দেখলে পৃথিবীতে ও ভারতবর্ষে ঘটে চলা অজস্র অমানবিক ঘটনা আঁকল 'লোভ, লালসা, মানবতার স্খলনে সাজ-সংসার বিপর্যস্ত । মানবতাহীন সভ্যতা আজ শ্মশানে পরিণত হয়েছে । সীমাহীন হয়েছে মানুষের লোভলালসা, হৃদয়হীন ধর্মান্ধ মানুষের আন্দোলন, একজনকে ধ্বংস করে ক্ষমতা কুক্ষিগত করতে চায় উন্মত্ত জন্তুরূপী স্বার্থপর মানুষ। সমগ্র পৃথিবী জুড়ে এ এক আনাশৃষ্টি, লোভের পাহাড়ে ঢাকা পড়েছে মনুষ্যত্বা এমন এক দারুন দুর্দিনে কবি রবীন্দ্রনাথকে - 'হে বন্ধু হে প্রিয়তম' বলে সমরণ করেছেন। এ যেন রবীন্দ্রনাথ থেকে দূরে সরে থাকার অঙ্গীকার করেও তাকে যেন গভীর ভাবে পাবার আকাঙ্খা। রবীন্দ্র পরবর্তী কবিদের রবীন্দ্রনাথ ছিন্ন বলে মনে হয় না, এ যেন তাকেই সাদরে গ্রহণ। সভ্যতার এ ক্রুরতা, অন্ধ স্বার্থপরতার বিষবাষ্প - 'সংক্রামিত মহামারি মানুষের মর্মে ও মজ্জায় ; এখন প্রানলাসী নির্বাসিত, সুন্দর, সুকুমার কৃত্তি আজ বিনষ্টিরর পথে, সমগ্র সমাজ সংসার বর্বর পশুদের হাতে যারা পৃথিবীর সমস্ত সৌন্দর্য ছিন্ন ভিন্নকরতে উদ্যত। এখন জীবনানন্দের 'অদ্ভুত আঁধার এক' এর যুগ যারা অন্ধ, হৃদয়হীন তারা অনুভব করে বেশি, এবং চোখে দেখতে পায়, সেই বর্বব রাক্ষসের দল হাঁকে - 'আমি শ্রেষ্ঠ, সবচেয়ে বড়ো।' যা কিছু সুন্দর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি আজ তা এই উন্মত্ত জন্তুর মুখে, কবির কথায় - 'জীবনের সোনার হরিণ।' উন্মত্ত এই সব হৃদয়হীনের ইংস্র থাবায় আবদ্ধ।

সৃষ্টিশীল, সুশীল সমাদরে প্রতিনিধি বুদ্ধদেব বসু তা অনুভব করেছেন । সমগ্র পৃথিবীজুড়ে যেন ঘোর সংকটকাল উপস্থিত, প্রাণ আজ রুদ্ধ, স্তব্ধ । যে ভারতভূমি ছিল অহিংসারপ্রতিমূর্তি, সর্বসথা আজ সেখানে শোষন - শাষন - ক্ষমতার - 'লুব্ধতার লালা ঝরে ।' সমগ্র ভারত জুড়ে বিবেকহীন উন্মত্ত বর্বর মানুষের স্বার্থকামী দৃষ্টি কবিকে স্থির থাকতে দেয়নি। এমন দুঃখ যন্ত্রনার দিনে কবি গুরুর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা -

'এ নরক সহিতে কি পারিতাম, হে বন্ধু, যদিনা
লিপ্তহত র্তে মোর, বিদ্ধ হত গূঢ় মর্মমূলে
তোমার অক্ষয় মন্ত্র।'

টিপ্পনী

টিপ্পনী

চারিদিকে লোভাতুর দৃষ্টি, নাগিনীদের বিষাক্ত নিঃশ্বাস এরই মধ্যে এগিয়ে চলবে মানব সভ্যতা - 'মানুষের উপরে বিশ্বাস হারানো পাপ।' তার উপরে আশ্বাস বিশ্বাস রাখতে হবে। রবীন্দ্রনাথে এই আশ্বাস বিশ্বাসের অমিয়বানী তো আমাদের কাছে 'অক্ষয়মন্ত্র'। সমগ্র পৃথিবীর কাছে এই ঘোর দুর্দিনে - বুদ্ধদেব বসু রবীন্দ্রনাথের এই বিশ্বাসের বানী অন্তরে লাভ করেছেন বলেই -

'তাই তো মানি না ভয়, জীবনের জয় হবে জানি।'

রবীন্দ্র পরবর্তী আধুনিক কাব্যান্দোলনের সেনানি বুদ্ধদেব বসু ১৪ পংক্তির কবিতাতে কবি গুরুকে - হে বন্ধু, হে প্রিয়তম চলে সমআহ্বোন করেছেন। তাঁর কাছ থেকে যে অভয়বাণী তিনি লাভ করেছেন সেই অক্ষয় মন্ত্রের জোরে ভয়কে আর গ্রাহ্য করেন না। এ অন্যায় অত্যাচার - ঘৃনার নরক তার পক্ষে সহ্যকরা সম্ভব হত না যদি -

'লিপ্তহত রক্তে মোর, বিদ্ধ হত গূঢ় মর্মমূলে
তোমার অক্ষয়মন্ত্র।'

রবীন্দ্রনাথ আমাদের জীবনে কত প্রাসঙ্গিক তা কবিতাপাঠে অনুমেয়। পৃথিবীর ঘোর দুর্দিনে তিনি যেন আমাদের সেই আলোর পথ দেখানো নাবিক, যে পথে আমাদের জীবনের ক্রম উত্তরণ সেই পথেই তিনি আমাদের নিয়ে যাচ্ছেন তার উপর বিশ্বাসে ভর করে এগোতে হবে। বুদ্ধদেব বসু রবীন্দ্রনাথে অক্ষয়মন্ত্র আকড়ে ধরেছেন জানেন জীবনের হয় হবেই।

আদর্শ প্রশ্নাবলী :

ক. 'রবীন্দ্রনাথের প্রতি' কবিতার ভাববস্তু আলোচনা কর।

খ. 'হে বন্ধু হে প্রিয়তম' - বলে কোন পরিস্থিতিকে, কাকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে?

গ. 'বর্বর রাক্ষস হাঁকে, 'আমি শ্রেষ্ঠ, সবচেয়ে বড়ো' - কবি বুদ্ধদেব বসু কাদের এই বর্বর রাক্ষস বলে বর্ণনা করেছেন জানাও।

ঘ. '..... অন্তরে লভেছি তব বাণী
তাই তো মানি না ভয়, জীবনেরই হয় হবে জানি।' - কবি কার বাণী জীবনে লাভ করেছেন? কেন ভয় জানেন না? কিভাবেই বা জীবনের হয় হবে মনে করেছেন?

এক ঝাঁক পায়রা

বিমলচন্দ্র ঘোষ

টিপ্পনী

উজ্বল এক ঝাঁক পায়রা
সূর্যের উজ্বল রৌদ্র,
নীঃসীম ঘননীল অম্বর
গ্রহতারা থাকে যদি থাক নীল শূন্যে।
হে কাল, হে গম্ভীর,
অশান্ত সৃষ্টির
প্রশান্তর মন্থর অবকাশ,
হে অসীম উদাসীন বারোমান।
চৈত্রের রৌদ্রের উদ্দাম উল্লাসে
তুমি নেই, আমি নেই, কেউ নেই,
শুধু শএত পিঙ্গল কৃষ্ণ
এক ঝাঁক উজ্বল পায়রা।
উপুরের রৌদ্রের নিঃঝুম শান্তি
নীল কপোতাক্ষীর কান্তি
এক খালি নাগরিক আকাশে
কালজয়ী পাখনার চঞ্চল প্রকাশে -
চৈতালী সূর্যের থমথমে রৌদ্রে
জীবন্ত উল্লাসে উড়ছে
পাঁচরঙা এক ঝাঁক পায়রা।
একফালি আকাশে কোল - ঘেঁষা কার্নিশ
রংটা পম্বুজ, দিগন্তে চিমনি,
সোনার প্রহর কাঁপে চঞ্চল পাখনায়
ছোট্ট কালের ঘোরে প্রাণ তবু টন্ময়
লীলায়িত বিস্ময়।
সৃষ্টির স্বাক্ষর এক ঝাঁক পায়রা।
রূপালি পাখায় কাঁপে ত্রিকালের ছন্দ
দুপুরের ঝলমলে রোদ্দুর,

টিপ্পনী

হে কপোত, পারাবত, পায়রা,
যে - দিকে দু চোখ যায় দেখা যায় যদ্দুর
রূপালি পাখায় আঁকা শূন্য।
আকাশি - ফুলের শ্বেত পিঙ্গল কৃষ্ণ
কম্পিত শত শত উড়ন্ত পাপড়ি
তুমি নেই, আমি নেই, কেউ নেই,
দুপুরের ঝলমলে জীবন্ত রৌদ্রে
ওড়ে শুধু এক ঝাঁক পায়রা।

কবি পরিচিতি : বিমলচন্দ্র ঘোষ [১৯০৮ -৮১ / ৮২]

জন্ম : মায়ের মামার বাড়ি ১ নং বলরাম বসু ফাস্ট লেনে ১২ই ডিসেম্বর ১৯১০। ১৯১৬ ভবানীপুর নর্থ চক্রবেড়িয়া ইনস্টিটিউশানে পরথম শ্রেনীতে ভর্তি। ১৯২৯ ম্যাট্রিকুলেশান। পরে বিজ্ঞান নিয়ে সেন্ট জেভিয়ার্সে ভর্তি হন। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে গান্ধীজীর ডাকে সাড়া দিয়ে কলকাতায় ছাত্র আন্দোলনে যোগদান। রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে ও তার সংযোগ লক্ষ্য করা যায়। তিনি একাধারে কবি ও গীতিকার।

বিমলচন্দ্র রচিত কাব্যগ্রন্থ :

জীবন ও রাত্রি (১৯৩৩), দক্ষিণায়ন (১৯৩১), উলুখড় (১৯৪৩), দ্বিপরহর ও অন্যাণভ কবিতা (১৯৪৫), ফতোয়া (১৯৪৭) নানকিং (১৯৪৮), সাবিত্রী (১৯৫১), সপ্তকান্ড রামায়ন (১৯৫১), ্যুখাভারত (১৯৫১), উদাত্ত ভারত (১৯৫৬), রক্তগোলাপ, হাতেখড়ি, ছায়াপথ (১৯৫৫), কলকাতা (১৯৭৬)।

পাঠ পর্যালোচনা :

রবিন্দ্র পরবর্তী কালের প্রখ্যাত অধুনিক কবি বিমলচন্দ্র ঘোষ। তাঁর কবিতায় দেখতে পাই মুক্ত প্রাণের আনন্দ।বাথা বন্ধহীন এক সীমাহীন প্রান্তর ও চঞ্চল প্রাণের পরতীক 'এক ঝাঁক পায়রা'। পায়রা আমদের কাছে শান্তির দূত, মুক্তি ও স্বাধীনতার বার্তাবাহক। এই কবিতায় উজ্জ্বল এক ঝাঁক পায়রা সূর্যের নরম রৌদ্রে চঞ্চল পাখা মেলে উড়ে চলেছে। মাকাল তার নিজের ছন্দে চলেছে, এ অনন্ত প্রান্তরে নীল শূন্যে গ্রহতারাদের অবস্থান। এ প্রকৃতি যেন উদাসীন। আর তারই কোলে প্রাণের চঞ্চলতায় - এক ঝাঁক পায়রা, দ্বিতীয় স্তবকে এসে কবি চৈত্রমাসের রৌদ্রের উদ্দাম উল্লাসের কথা শোনালেন এবং বললেন

সেখানে আমি, তুমি, কেউনেই কিন্তু আছে -

‘শুধু শ্বেত পিঙ্গল কৃষণ
এক ঝাঁক উজ্জ্বল পায়রা।’

কবি এই স্তবকেই উদার বিশাল মুক্তির প্রান্তর থেকে নেমে আসলেন ‘নাগরিক আকাশে’। এখানে কর্মচঞ্চলতাই মূলকথা, পায়রার কালজয়ী পাখনার চঞ্চলতার কথা বলে তাকে প্রতিষ্ঠা করলেন। এখানে চৈতালি সূর্যের রোদ যেন থমথমে। তাই জীবন্ত উল্লাসে উড়ে চলছে - ‘পাচরঙা এক ঝাঁক পায়রা।’

কবি নেমে এলেন শহর নগরের ভিড়ে। যেখানে আকাশ দীগন্ত বিস্তৃত নয়, আঁটকে যায় অট্টালিকার মাথায়। এ শহরে একখানি আকাশ দেখা যায়, রংচটা গম্বুজ, দিগন্ত বিস্তৃত চিমনি তাই কবি প্রকাশ করল সেই অনুভূতি -

‘একখানি আকাশের কোল - ঘেঁষা কার্নিশ
রংচটা গম্বুজ, দিগন্তে চিমনি,’

তবুও প্রাণ - চঞ্চল, জীবন নদী বয়ে চলবে তা কবির কাছে -
‘লীলায়িত বিস্ময়’, সেই মহাসৃষ্টির কথা বললেন এভাবে -

‘সৃষ্টির স্বাক্ষর এক ঝাঁক পায়রা’

জীবনস্পন্দনে কাঁপে সোনার প্রহর, আবার কবি রুপোলি পাখার প্রসঙ্গ তুলে - ত্রিকালের ছন্দ কাঁপার প্রসঙ্গ তুলে এনেছেন। এই পায়রাকে বিভিন্ন নামে সম্বোধন করে যে দিকে চোখ যায় সবই শূন্য বলে জানিয়েছে। কবি শূন্য দিগন্ত, অসীম ঘননীল আকাশ, জীবন্ত উল্লাস, অসীম, উদাসীন ব্যবহার করে উদার মুক্ত মুক্তির জীবনান্দের কথা বললেন।

জীবন কত বর্নময়, বিচিত্র তার গতি, যেন কবির চোখে শত শত উড়ন্ত পাপড়ি’ যা জীবনের স্পন্দনে প্রকম্পিত। আকাশী ফুলের যত রং এর বৈচিত্র্য তার এ জগৎ সংসারে কালের নিয়মে আমি, তুমি কেউ না থাকলেও প্রাণের স্পন্দন তার লীলায়িত ছন্দেই চলতে থাকবে, কখনোই স্তব্ধ হয়ে যাবে না। তাই তো কবি জীবন্ত রৌদ্রের প্রসঙ্গ নিয়ে আনলেন। যে দিন আমরা থাকব না সে দিন ও পৃথিবীর কর্ম চঞ্চলতা থাকবে। জীবনের সই প্রবহমানতা বোঝাতে শেষ স্তবকের অন্তিম পংক্তিতে বললেন - ‘ওড়ে শুধু এক ঝাঁক পায়রা।’

বিমলচন্দ্র ঘোষ তার ‘একঝাঁক পায়রা’ কবিতাটি ৩৬টি পংক্তি ও পাঁচটি স্তবকে বকতব্য তুলে ধরেছেন সচ্ছন্দ গতিতে।

কবিতাটি গান ও বটে। তনি একাধারে কবি ও গীতিকার তাই কবিতাটি সংগীত

টিপ্পনী

টিপ্পনী

প্রধান হয়ে উঠেছে। কবিতাটির মধ্যে আছে এক উদ্দাম প্রাণের সাংগীতিক মূর্চ্ছনা। প্রথম দিকে পায়রার বাধা বন্ধহীন ভাবে উজ্জ্বল নীলাকাশে ডানা মেলে চলার মধ্যে আছে উন্মুক্ত বন্ধনহীন সুদূরের প্রার্থনা। সৃষ্টির মহোল্লাস কিন্তু ধীরে ধীরে বাস্তব পৃথিবীর কথা ছায়া ফেলেছে। প্রবেশ করেছে এক নাগরিক আবহাওয়া যেখানে বাধা পাচ্ছে দীগন্তের প্রসার তা। তিনি ভাববাদে প্রথমে বিচরন করেন পরে বাস্তবাদে এসে শেষ করেন এ কবিতা ও যেন সেই আধাঁরের। সমালোচকের ভাষায় বলা যায় -

'আধ্যাত্মিক ভাববাদী থেকে বস্তুবাদী ভাবনার অভিমুখে তাঁর কাব্যের যাত্রা শুরু হয়।'

আদর্শ প্রশ্নাবলী :

ক. বিমলচন্দ্র গোষের 'এক ঝাঁক পায়রা' কবিতাটির নামকরন কি সার্থক হয়েছে আলোচনা কর।

খ. 'একফালি আকাশের কোল - ঘেঁষা কার্নিশ
রংচটা গম্বুজ, দিগন্তে চিমনি, - পংক্তিগুলিতে কবির মনোভঙ্গির পরিচয় দাও।

গ. 'তুমি নেই, আমি নেই, কেউ নেই,
দুপুরের ঝলমলে জীবন্ত রীদ্রে
ওড়ে শুধু এক ঝাঁক পায়রা।' -
তুমি, আমি, কেউ যেখানে নেই সেখানে শুধু কে থাকে ? কেনই বা কবি শুধু এক ঝাঁক পায়রার প্রসঙ্গ এনেছেন আলোচনা কর।

আমার ভারতবর্ষ

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

টিপ্পনী

আমার ভারতবর্ষ
পঞ্চাশ কোটি নগ্ন মানুষের
যারা সারাদিন রৌদ্রে খাটে, সারারাত ঘুমুতে পারে না
ক্ষুধার জ্বালায়, শীতে ;
কত রাজা আসে যায়, ইতিহাসে ঈর্ষা আর দ্বেষ
আকাশ বিষাক্ত করে
জল কালো করে, বাতাস ধোঁয়ায় কুয়াশায়
ক্রমে অন্ধকার হয়।
চারদিকে ষড়যন্ত্র, চারদিকে লোভীর প্রলাপ
যুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষ আসে পরস্পরের মখে চুমু খেতে খেতে
মাটি কাঁপে সাপের ছোবলে, বাঘের থাবায় ;
আমার ভারতবর্ষ চেনে না তাদের
মানে না তাদের পরোয়ানা ;
তার সন্তানেরা ক্ষুধার জ্বালায়
শীতে চারিদিকের প্রচন্ড মারের মধ্যে
আজও ঈশ্বরের শিশু, পরস্পরের সহোদর।

লেখক পরিচিতি : বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় [১৯২০ - ১৯৮৫]

ঢাকার বিক্রমপুরে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম। ছোট বেলায় পূর্ববঙ্গে শৈশব কাটলেও পরে কলকাতায় ড় হয়ে ওঠেন। তিনি গ্রাম বাংলার চিত্র যেমন কবিতায় এনেছেন তেমনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা, দেশভাগ, ভিয়েতনামের মুক্তি যুদ্ধ, রাজনৈতিক চেতনা স্থান পেয়েছে।

রচনাসম্ভার :

'গ্রহচ্যুত (১৯৪২), রানুর জন্য (১৯৫১), উলুখড়ের কবিতা (১৯৫৪), লখিন্দর (১৯৫৬), জাতক, তিন পাহাড়ের স্বপ্ন (১৯৬৩), সভা ভেঙে গেলে, ওরা যতই চক্ষু রাঙায় (১৯৬৮), মানুষের মুখ (১৯৬৯), এই জন্ম, জন্মভূমি, পৃথিবী ঘুরছে (১৯৭৫), ন্যাংটো ছেলের

টিপ্পনী

সূর্য নেই (১৯৭৭), নীলকমল লালকমল, আমার কবিতা (১৯৮৫), শ্রেষ্ঠ কবিতা (১৯৭০)। ১৯৮২ খ্রীষ্টাব্দে 'শ্রেষ্ঠ কবিতা'র জন্য রবীন্দ্র পুরষ্কার পান। মৃত্যুর পর প্রকাশিত কাব্য 'অফুর্ত জীবনের মিছিল' (১৯৮৬)।

পাঠ পর্যালোচনা :

স্বদেশের প্রতি, স্বাধীনতার প্রতি, মানুষের প্রতি আস্থাশীল কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বাংলাদেশ - ভারতবর্ষের স্বাধীনতা দেশভাগ রক্তক্ষয়ী আন্দোলন ও মানুষের নির্যাতন, দুর্ভিক্ষ যন্ত্রনার কথা যেমন তার কাব্যে স্থান পেলে তেমনি ইশ্ব রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও বাদ যানি। তার কবিতায় বিষ্ণুদের প্রভাব পরলক্ষিত হয়। এক সময় তিনি কমিউনিষ্ট রাজনীতির প্রতি আস্থাশীল হয়ে পড়েন। সুকান্ত ভট্টাচার্যের মতো সমগ্র পৃথিবী জুড়ে ক্ষুধার প্রসঙ্গ তুলে ধরে বললেন - 'অনাহার মৃত্যু নয়। অনাহারে মৃত্যু নয়।' একজন মানুষ হয়ে মানুষের জন পথে পা বাড়ালেন। 'আমার ভারতবর্ষ' কবিতায় সেই সব নিপীড়িত নির্যাতিত, শোষিত মানুষের সর্নবানী ঘোষনা করলেন।

এই সময়কার কবিদের কাছে ভারতবর্ষ স্বপ্ন, ভারতবর্ষের সুখ দুঃখ তাদের সুখ দুঃখ। স্বদেশের প্রতি শ্রদ্ধার শেষ নেই, তাই বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বলতে পারেন 'আমার ভারতবর্ষ', যেখানে দেশপ্রেম, কর্তব্যে তাদের হৃদয় ভরে আছে। বিভিন্ন কবিতায় সাধারণ মানুষের কথাই যেন মুখ্য, 'আমার ভারতবর্ষ' কবিতায়ও খেটে খাওয়া মেহনতি মানুষের কথা শুরুতেই উচ্চারিত হল -

'পঞ্চাশ কোটি নগ্ন মেনুষের
যারা সারাদিন রৌদ্রেখাটে, সারারাত ঘুমতে পারে না
ক্ষুধার জ্বালায়, শীতে ;'

সমস্তদিন কঠোর পরিশ্রম করলে ও তাদের বস্ত্রর অভাব এবং ক্ষুধার অসহনীয় জ্বালায় জ্বলতে দেখা যায়। যুদ্ধ, দুভিক্ষ, পীড়িত খেটে খাওয়া, শীতের জ্বালায় যাদের অঙ্গ জ্বলে তাদের নিয়েই বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'আমার ভারতবর্ষে'র ভুবন। এমনই ক্ষুধার জ্বালা 'রুটি দাও' কবিতায় চিত্রিত। এ জীবন দায়ী রুটি কোনস্তরে পৌঁচেছে তা শেষের দুটি চরণ পাঠ নিলে বোঝাযায় -

'হৃদয় বিষাদ চেতনা তুচ্ছ গনি
রুটি পেলে দিই প্রিয়ার চোখের মনি।'

দু টুকরো রুটির জন্য হেসে দেশের স্বাধীনতা ও দিতে প্রস্তুত। আসলে এ হল দরিদ্র ভারতবর্ষের বাস্তবতা যা নির্মম হলেও সত্যি। ভারতবর্ষের মানুষের নগ্ন রূপ কবিতার দেহে

প্রকাশ পেল, এ দেশের মাটিতে কত রাজা আসে আর যাড় তাদের শাসন শোষনের চিহ্নভার পড়ে আছে শিশুপাঠ্য কাহিনীতে সেই ঘটনা মেখ ঢাকে। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় ঈর্ষা আর দ্বেষ আকাশ ছেয়েছে। ক্রুরতার বিষবাষ্পে ভারতবর্ষের জল - স্থল - আকাশ - বাতাস ক্রমে নিরালোক হয়ে আসে।

কবি দেশ মাতৃকাকে ভালোবেসে দৃঢ়তার সঙ্গে ভারতবর্ষের এমন বাস্তব সত্য ঘটনার ছবি আঁকলেন, খুব সাধারন মানুষের সংগ্রামের দুর্জয় লোভ উঠল প্রকট হয়ে। এখন ভারতবর্ষের বুকে মানুষের জীবনে 'যুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষ আসে পরস্পরের মুখে চুমু খেতে খেতে।' বিষাক্ত সাপের ছোবলে ও বাঘের থাবায় বার বার নীল হয়েছে ভারতভূমি, আর বাঘের থাবার নখদ্রংশে ক্ষত বিক্ষত ভারত হৃদয়। কিন্তু কোন দিনই ভারতবর্ষ আমল দেয়নি তাদের, 'মানে না তাদের পরোয়ানা;' ক্ষুধায় আর শীতে ভারতবাসীর জীবন বিপন্ন হলে ও পলায়ন বিমুখ নয় তারা পরিশ্রমী জীবন্ত প্রাণ এক। রাজা - উজীর - জোতদার - জমিদার তাদের নিষ্ঠুর লোভ লালসার চিত্র 'আমার ভারতবর্ষে'।

ভারতবর্ষের বুকের উপর দিয়ে কত শাসকের রথচক্র চলে গেছে, চলে গেছে কাঁটা বাঁধানো পদভার। ভারতবর্ষের বুকে তার কোন পদভার চিহ্ন থাকলেও মনে রাখেনি 'আমার ভারতবর্ষ'। সবাইকে আপন করে নিয়েছে এ সহনশীল ভূমি। জাতি - ধর্ম - বর্ণ - নির্বিশেষে সবাই আমরা ভ্রাত্বিত্বের বন্ধনে আবদ্ধ আমরা সেই একই অমৃতের পুত্র। দুঃখ - দারিদ্র্য - ক্ষুধা - শোষণ মানুষের অন্তঃসম্পর্ককে বিনষ্ট করতে পারে না। বিদেশিদের দুর্বার লোভ, ভারতভূমিকে ক্লেদাক্ত করলেও ছিন্ন ভিন্ন করে অনৈকের শিকল পরাতে পারেনি, ভারতবর্ষের বাস্তব ভিতের উপর দাঁড়িয়ে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অস্তিত্ব রক্ষার নিত্য সংগ্রাম কে বিচিত্র করলে 'আমার ভারতবর্ষে'। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কেমন করি, কাদের জন্য কলম ধরলে তা অশোক কুমার মিত্রের লেখায় -

'বাঁচার ঐকান্তিক ইচ্ছায় যাদের প্রায়শই দেখি অন্ধকারের,অসাফল্যের খোলসটাকে ছিঁড়ে ফেলার ব্যর্থ চেষ্টা করতে - রক্তকরবীর রাজার জালের মত সে জাল দুরদৃষ্টকে রাখে অক্ষত তার ইচ্ছার বাইরে ছেঁড়া তো দূরে থাক ছোঁয়া ও যায় না সে জালকে। কিন্তু ব্যক্তিগত সহানুভূতি তো জানানো যায়! গভীর মমত্ববোধ এবং সহমর্মিতা নিয়ে পাশে তো দাঁড়ানো যায় - ভাগ করে নেওয়া যায় তার অর্জিত দুঃখকে। এই সমব্যথী কবি হলেন বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।'

আদর্শ প্রশ্নাবলী :

ক. 'আমার ভারতবর্ষ' কবিতার ভাববস্তু আলোচনা কর।

টিপ্পনী

টিপ্পনী

খ. 'আমার ভারতবর্ষ' কবিতার নামকরন কি যথার্থ? ব্যাখ্যা কর।

গ. 'কত রাজা আসে যায়, ইতিহাসে ঈর্ষা আর দ্বেষ
আকাশ বিষাক্ত করে' - কাদের আসা যাওয়ার কথা বলা হয়েছে ? আকাশ বিষাক্ত হওয়ার প্রকৃত কারণ কি ?

ঘ. 'আমার ভারতবর্ষ চেনে না তাদের
মানে না তাদের পরোয়ানা' - কোন ভারতবর্ষের কথা বলা হয়েছে ? কাদের চেনে না ? মানে না ? এ ভারতবর্ষ জানা ও।

ঙ. যারা সারাদিন রৌদ্রে খাটে, সারারাত ঘুমুতে পারে না' -
- কবি কাদের কথা বলেছেন ? ব্যাখ্যা কর।

অবনি বাড়ি আছে

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

টিপ্পনী

দুয়ারে এঁটে ঘুমিয়ে আছে পাড়ে
কেবল শুনি রাতের কড়ানাড়া
'অবনী বাড়ি আছে?'
বৃষ্টি পড়ে এখানে বারোমাস
এখানে মেঘ গাভীর মতো চরে
পরাঙ্মুখ সবুজ লালিঘাস
দুয়ার চেপে ধরে -
'অবনী বাড়ি আছো?'
আধেকলীন হৃদয়ে দূরগামী
ব্যাথার মাঝে ঘুমিয়ে পড়ি আমি
সহসা শুনি রাতের কড়া নাড়া
'অবনী বাড়ি আছো?'

লেখক পরিচিতি : শক্তি চট্টোপাধ্যায় [১৯৩৩ - ১৯৯৫]

জন্ম : দক্ষিণ ২৪ পরগনার বহড়ুতে, পড়াশুনা বিষয়ে যতদূর জানা যায় তিনি প্রথমে মির্জাপুরের সিটি কলেজে কর্মাস নিয়ে ভর্ত্তি হয়ে পরে বাংলা অনার্স নিয়ে প্রসিডেন্সিতে চলে আসেন। সাহিত্য জীবনে তিনি একাধিক ছদ্ম নাম ব্যবহার করেছেন, যেমন - প্রথম কবিতা রূপচাঁদ পক্ষী ছদ্ম নামে, পরে স্ফুলিং সমাদ্দার, অভিনবগুপ্ত, শক্তিনাথ কাব্যতীর্থ।

কাব্যগ্রন্থ ও অন্যান্য :

'ধর্মে আছে জিরাফে ও আছো', 'যেতে পারি কিন্তু কেন যাব' (১৯৮২), 'ছিন্ন - বিচ্ছিন্ন' (১৯৭৬), 'সুন্দর এখানে একান্তয়', 'আমি চলে যাচ্ছি', 'উড়ন্ত সিংহাসন', ভালোবেসে ধূলায় নেমেছি, আমি একা বড়ো একা (১৯৮১)। ঈশ্বর থাকেন হলে (১৯৭৫), প্রচ্ছন্ন স্বদেশ (১৯৮২), হেমন্তের অরন্যে আমি পোষ্টম্যান, প্রভৃতি।

পাঠর্যালোচনা :

রবীন্দ্রভারতী আধুনিক কবিদের মধ্যে শক্তিশালী হলেন শক্তি চট্টোপাধ্যায়। কাব্য

টিপ্পনী

সাধনাই যেন তাঁর প্রাণ। 'অবনী বাড়ি আছে' কবিতাটি নেওয়া হয়েছে 'ধর্মে আছো জিরাফে আছো' (১৯৬৫) নামক কাব্যগ্রন্থ থেকে। নাতিদীর্ঘ কবিতা কত শক্তিশালী হতে পারে তার পরিচয় বহন করছে 'অবনী বাড়ি আছো'। এমন এক কবিতা যা বিশ্লেষন করা বা তার মধ্যে কবির নির্মিত ভাবলোকের স্বর্নবিন্দু খোঁজা সত্যিই দুরুহ।

'অবনী বাড়ি আছো' কবিতাটির নামকরনের মধ্যে আছে প্রতীকময়তা, আছে গভীর ব্যঞ্জনা। কবিতাটির সাধারণ পাঠ নিলে একরকম আর তা গভীর অনুসন্ধানে উঠে আসে সময়ের ছবি আর কবির আত্মদর্শনের প্রেক্ষাপট। এই কবিতাটি যেখান থেকে নেওয়া সেই কাব্য গ্রন্থের নাম ও ব্যঞ্জনাবহ। প্রথম স্তবকে কবির বর্ননা মেঘে গম্ভীর নাদ, বর্ষনমুখর প্রকৃতি। সমগ্র পাড়া এই দুর্যোগের দিনে দুয়ার এঁটে ঘুমিয়ে পড়েছে। অবনী ও সেই রাতের ঘুমের বাইরে নয়। এমন এক প্রকৃতিতে গভীর রাতে অন্ধকারে রাতের কড়ানাড়া এবং অবনীর নাম ধরে ডাকা সত্যিই এক রহস্যময় জগতে নিয়ে যায়। কড়ানাড়ার সঙ্গে অবনীর নাম ধরে ডাক যেন বদ্ধ দরজায় দরজায় আঘাত করে করে এক গুঞ্জরণ তুলেছে। কে এই অবনী? রাতের আঁধারেই বা তাকে ডাকা হচ্ছে কেন? সবই এক রহস্যময়। এ সৃষ্টিশীল শষ্যশ্যামলা দেশে বৃষ্টি পড়ে বারোমাস, মেঘ এখানে গাভীর মতো চরে। কিন্তু তার পরেও রাতে কড়ানাড়ার সঙ্গে ডাক পড়ে -

'অবনী বাড়ি আছো?'

কবিতাটি দ্বিতীয় স্তবকে কবি হৃদয় চেতন অবচেতনের মাঝামাঝি অবস্থায়। এক অজানা দূরগামী ব্যাথায় ভরকরে ঘুমিয়ে পড়তেই সহসা শোনা গেল আবার সেই মস্তিষ্কে অনুসরণন জাগানো কড়া নাড়ার শব্দ এবং অবনীর নাম ধরে ডেকে বলছে -

'অবনী বাড়ি আছো?'

শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের এই কবিতা আদি অন্ত সেই কড়ানাড়া এবং 'অবনী বাড়ি আছো?'। আলোচনের সব রকম দরজা খুলে রেখে কবিতাটি বিশ্লেষন জরুরী। গভীর রাতের প্রতীকে এখানে আবহমান যুগের বন্ধ্যাত্বের দিকটি তুলে ধরা হয়েছে। এক বন্ধ্যাত্ব সময়ের সঙ্গে অবনীর বিশেষ সংযোগ সূত্র ঘটানো হয়েছে বলে মনে হয়। এই রাতের ডাক যেন শুকনো ক্যাকটাস, যেখানে গাভীর মতো মেঘ চরে সেখানে আর কিসের প্রয়োজন ? কিন্তু এই প্রয়োজনই এ কবিতার প্রাণবিন্দু। অবনী কে এত প্রয়োজন। প্রকৃতপক্ষে - 'আবহমান মানব সভ্যতাকে চেনে অবনী।' এ অবনী আবেদন মানুষের বুদ্ধি বিবেক চৈতন্যের দিকে, যা ছাড়া অন্ধকারে, 'অদ্ভুত আঁধারে' ডুবে ডাকে সমাজ - সংসার। কবি অনুভব করলেন মানুষ এক অদ্ভুত আঁধারের দিকে নিমর্জনশীল। এ এক বিষন্ন যুগ আমাদের শরীর মন এ সময় বিষন্ন একাকী বিমূঢ়। এমন এক অবস্থা থেকে মানব সমাজকে বাঁচাতে পারে এই 'অবনী।'

টিপ্পনী

'অবনীর' অর্থ হল ধরিত্রী, পৃথিবী, কাল রাত্রির যন্ত্রনা ক্লিষ্টতার মধ্যে কড়ানাড়ার শব্দে সচকিত সবাই। কাল নিদ্রা থেকে আমাদের জগতে হবে নৈরাশ্য দুঃখ যন্ত্রনা দূর করে নতুন পৃথিবীর দিকে এগিয়ে চলতে হবে। এই যে অন্ধকার ঘুমন্ত পাড়া সবই যুগেরই চিত্র। আর এই গোরান্ধ রাতে যে এসে কড়া নাড়ছে - 'আগন্তুক অবনীর কোন অস্তিত্ব হতে পারে, হতে পারে অবনীর বিবেকদূত, কিংবা ক্লান্ত ভয়ার্ত রাত্রির বিষন্নতা ও হতে পারে।' এই রাতের অন্ধকার বা আগন্তুক অবনীর অস্তিত্বকে খুঁজে ফিরেছে তাই কবিতাতে তিন তিন বার অবনীকে ডাক দিয়ে যাওয়া। কবির এক আত্মদর্শনের কাহিনী যার সঙ্গে মিল আছে অবনীর শুভশক্তির।

শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের যা কামনা সেই - 'প্রত্যেক মানবের শুভ শক্তির জাগরন ঘটাতে চেয়েছেন, শক্তি চট্টোপাধ্যায়। অবনীকে কেন্দ্র করে তিনি সমগ্র মানবের মগ্ন চৈতন্যের ঘুম ভাঙাতে চেয়েছেন।' 'অবনী বাড়ি আছে' কবিতাটি বিশ্ব সাহিত্যের আসরে আসন পেতেছে 'Walter De la Mare এর 'The listeners' প্রভাব যুক্ত এ কবিতা কবি মন 'অবনী বাড়ি আছো'তে দার্শনিকতায় ভরপুর, তেমনি Listners এ দেখি ঘোড়ায় চড়ে আসা নায়কের গভীর রাতের সেই পরিবেশে গিঞ্জাসা - 'Any one is the house?'

দুটি স্তবকে ১২ পংক্তির কবিতা 'অবনী বাড়ি আছো' এই কবিতায় কয়েকটি বিষয় গুরুত্বলাভ করেছে - যেমন -

বর্ষণমুখর রাতের অন্ধকারে ঘুমন্ত পাড়ার ছবি। রহস্যময় পরিবেশে আগন্তুক আগমন। কবি রূপী অবনীর আত্মোপলব্ধী। বার বার 'অবনী বাড়ি আছো ?' ডাকে অন্ধকারের গাম্ভীর্য ভেঙে পড়া। কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় বারোমাস বৃষ্টিপড়া, গাভীর মতো মেঘের চরে বেড়ানোর চিত্ররূপ ফুটিয়ে তুলেছেন তিনি। কবিতার বহর বেশিনা হলে ও গভীরতায় অতল চৈতন্যের কাছে আবেদন রাখে।

আদর্শ প্রশ্নমালা :

ক. 'অবনী বাড়ি আছো' কবিতাটির ভাববস্তু আলোচনা করে দেখাও।

খ. 'দুয়ারে এঁটে ঘুমিয়ে আছে পাড়া
কেবল শুনি রাতের কড়ানাড়া
'অবনী বাড়ি আছে?' - কে এই অবনী ? কেনই বা রাতের কড়া নাড়া ? উপরিউক্ত পংক্তিগুলি অবলম্বনে ব্যাখ্যা কর।

গ. 'অবনী বাড়ি আছো' কবিতাটির নামকরনে আছে গভীর ব্যঞ্জনা আলোচনা কর।

ঘ. অবনী কি কবির বিবেক ? এ সম্পর্কে নিজের মতামত ব্যাখ্যা কর।

টিপ্পনী

কেউ কথা রাখেনি

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

টিপ্পনী

কেউ কথা রাখেনি, তেত্রিশ বছর কাটলো, কেউ কথা রাখেনি
ছেলেবেলায় এক বোষ্টুমি তার আগমনী গান হঠাৎ থামিয়ে বলেছিল
শুক্লা দ্বাদশীর দিন বাকি অন্তরাটুকু শুনিয়ে যাবে।
তারপর কত চন্দ্রভুক অমাবসা এসে চলে গেল কিন্তু সেই বোষ্টামি
আর এলো না
পঁচিশ বছর প্রতিক্ষায় আছি।

মামাবাড়ির মাঝি নাদের আলি বলেছল, বড় হও দাদাঠাকুর
তোমাকে আমি তিনপ্রহরের বিল দেখাতে নিয়ে যাবো
সেখানে পদ্মফুলের মাথায় সাপ আর ভ্রমর
খেলা করে।
নাদের আলি, আমি আর কত বড় হব? আমার মাথা এই ঘরের ছাদ
ফুঁড়ে আকাশ স্পর্শ করলে তারপর তুমি আমায়
তিনপ্রহরের বিল দেখাবে?

একটা রয়্যাল গুলি কিনতে পারিনি কখনো
লাঠি-লজেন্স দেখিয়ে দেখিয়ে চুষেছে লস্করবাড়ির ছেলেরা
ভিখারীর মতন চৌধুরীদের গেটে দাঁড়িয়ে দেখেছি
ভিতরে রাস - উৎসব
অবিরল রঙের ধারার মধ্যে সুবর্ণ কঙ্কন পরা ফর্সা রমনীর।
কতরকম আমোদে হেসেছে
আমার দিকে তারা ফিরেও চায়নি।
বাবা আমার কাঁধ ছুঁয়ে বলেছিলেন, দেখিস একদিন আমরাও -
বাবা এখন অন্ধ, আমাদের দেখা হয়নি কিছুই
সেই রয়্যাল গুলি, সেই লাঠি - লজেন্স, সেই রাস উঙসব
আমায় কেউ ফিরিয়ে দেবে না।
বুকের মধ্যে সুগন্ধি রুমাল রেখে বরুনা বলেছিল
যেদিন আমাকে সত্যিকারের ভালবাসবে

টিপ্পনী

সেদিন আমার বুকেও এরকম আতরের গন্ধ হবে।
ভালোবাসার জন্য আমি হাতের মুঠোয় প্রাণ নিয়েছি
দুরন্ত ষাঁড়ের চোখে বেঁধেছি লাল কাপড়
বিশ্বসংসার তন্ন তন্ন করে খুঁজে এনেছি ১০৮টা নীলপদ্ম
তবু কথা রাখেনি বরুনা, এখনো তার বুকে শুধুই মাংসের গন্ধ
এখনো সে যে কোন নারী।
কেউ কথা রাখেনি, তেত্রিশ বছর কাটলো, কেউ কথা রাখেনা!

লেখক পরিচিতি : সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় [১৯৩৪ -

জন্ম : ফরিদপুরে, শৈশব কেটে ছিল বাংলাদেশে, পরে কলকাতা সমকালীন ঘটনা প্রবাহ তার স্মৃতিতে ছিল জাগরুক।

রচনা সংগ্রহ :

উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : আমি কী রকম ভাবে বেঁচে আছি (১৯৬৫), সোনালী দুঃখ (১৯৬৫), বন্দী জেগে আছো (১৯৬৮), আমার স্বপ্ন (১৯৭২), হঠাৎ নীরার জন্য (১৯৭৮), এসেছি দৈব পিকনিকে (১৯৭৭), স্মৃতির শহর (১৯৮৩), নীরা হারিয়ে যেও না (১৯৮৮), চলো যাই (১৯৮৯)।

জীবনান্দ দাশ, বিষ্ণু দে, কবি বুদ্ধদেব বসুর কবিতা, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে নাড়া দিয়েছিল। পাঠকের সঙ্গে কবিতার হারিয়ে যাওয়া সুরটি যেন তিনি ধরিএ দিলেন বক্তব্যের পরিবেশনের মধ্য দিয়ে, স্বাধীনতা উত্তরকালে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় - 'কবিতা ঘন্টিকী ; পরে বিখ্যাত পত্রিকা 'কৃত্তিবাস (১৯৫৩)। কবিতা ছোটগল্প, উপন্যাস রচনায় তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন তা তার কালজয়ী রচনা সম্ভার দেখলে সহজে অনুমেয়।

পাঠপর্যালোচনা :

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কবিতায় বিষাদ ; একাধিক বোধ, প্রতিক্ষা, বেদনা, স্বপ্নদেখা ও স্বপ্নভঙ্গের পূর্ন। কবির হৃদয় গভীরে আছে পাওআ না পাওয়া সময়ের এক অনিশ্চয়তা, দেশভাগ, স্বাধীনতা ও বিভিন্ন স্মৃতি। 'কেউ কথা রাখেনি' কবিতায় ছোটবেলার অসংখ্য স্বপ্ন, যৌবনের স্বপ্ন যারা মাথা চাড়া দিয়েছিল, সেই সব স্বপ্নভঙ্গের বেদনাহত কথা প্রাণ পেল। তেত্রিশ বছরের এক যুবক তার কিভাবে একে একে কেটে গেল, কেমন করে স্বপ্ন গুলো লুটিয়ে পড়ল মাটিতে তারই ক্রমিক ইতিহাস এই কবিতা। নিদারুন বেদনাহত হৃদয়কথা -

কেউ কথা রাখেনি, তেত্রিশ বছর কাটলো, কেউ কথা রাখেনি
ছেলেবেলায় এক বোষ্টুমি তার আগমনী গান হঠাৎ থামিয়ে বলেছিল
শুক্লা দ্বাদশীর দিন বাকি অন্তরাটুকু শুনিয়ে যাবে।

সেই অন্তরা শোনার আক্ষেপ থেকেই গেল, কত 'চন্দ্রভুক অমাবস্যা' কাটলেও সেই গান শোনা আর হয়ে উঠল না। এ গভীর পঁচিশ বছর কেটে গেল।

আশ্বাস আর আকাঙ্খায় দিন অতিবাহিত হতে থাকল - মামার বাড়ির নাদের আলি ও তাকে আশ্বাস দিয়েছে 'তিন পরহরের বিল' দেখাতে নিয়ে যাবে। অবশ্য নাদের আলি বলেছিল 'বড় হও দাদাঠাকুর' সেই ছোট বেলার স্মৃতিকথা, বিল দেখার আকাঙ্খা এখন প্রতীক্ষা। যে বিলে পদ্মফুলের মাথায় সাপ আর ভ্রমর খেলা করে, এমন অপূর্ব বিলের দর্শনানন্দ থেকে বঞ্চিত সে, তাই নদের আলির কাছে তার প্রশ্ন -

'নদের আলি, আমি আর কত বড় হব? আমার মাথা এই ঘরের ছাদ
ফুঁড়ে আকাশ স্পর্শ করলে তারপর তুমি আমায়
তিনপ্রহরের বিল দেখাবে?'

কত স্বপ্ন আকাঙ্খার মৃত্যুবরন করতে মধ্য থাকে এজীবনে তা কবিতায় খুব সাধারণভাবে সাধারণ বিষয় হিসাবে এসেছে। বাল্যকালে একটা রয়্যাল ওলি, লাঠি - লজেন্স, এর জন্য প্রত্যাশা। তার সামনে লস্কর বাড়ির ছেলেরা চুষতে চুষতে চলে যায়। চোখের সামনে সেই না পাওয়া এ বেদনা যেন তাড়া করে বেড়ায়। চৌধুরীদের গেটের সামনে ভিখারীর মত দাঁড়িয়ে রাস উৎসব দেখা, তার দিকে কারোর ফিরে না তাকেনোর করুন সুর যেন আমাদের শৈশব - কৈশরের জীবনের সমৃতিকে উস্কে দেয়, হরদয় করে ভারাক্রান্ত। এ চাওয়া না পাওয়া একটি বাল্য জীবনের নয়, সমগ্র মানুষের বাল্যজীবননের কথা, বেদনার সংগীত হয়ে বেজেছে।

বাবা কাঁধ ছুঁয়ে এ সকল আশা পুরনের আশ্বাস দিয়েছিল কিন্তু বাবা এখন অন্ধ তাই অতৃপ্ত থেকে গেছে সবই। শৈশব - কৈশর ফিরিয়ে গেলেও ছেলে বেলার সেই দিন গুলি আর ফিরে আসবে না, ভঙ্গে আক্ষেপ ঝরে পড়ল -

'সেই রব্যাল গুলি, সেই লাঠি - লজেন্স, সেই রাসউৎসব
আময় কেউ ফিরিয়ে দেবে না।'

'কেউ কথা রাখেনি' কবিতায় এত স্বপ্নভঙ্গের পরে প্রেমের কাছে সঁপে দিলেন নিজের প্রাণ। বরুনাকে পাবার এ ভালবাসা মধ্যে আছে উন্মাদনা আছে প্রাণের আবেগ। তাই বরুনার হৃদয়ে সুগন্ধি রুমালের গন্ধ পাবার জন বাজি রাখল নিজের জীবনা - বরুনাই একদিন বলেছিল যে দিন সত্যকারের ভালোবাসা সে দিন বরুনার বুকে সত্যিকারের আতরের গন্ধ হবে। তাই তরুন

টিপ্পনী

প্রেমিক -

‘ভালবাসার জন্য আমি হাতের মুঠোয় প্রাণ নিয়েছি
দুরন্ত ষাঁড়ের চোখে বেঁধেছি লাল কাপড়
বিশ্বসংসার তন্ন তন্ন করে খুঁজে এনেছি ১০৮টি নীল পদ্ম।

কিন্ত সে আশা ও ব্যর্থ বেদনাহত হয়ে গেছে। বরুনা তার কথা রাখেনি। সে এখন অন্য কোন নারী। বেদনা হত কবি হৃদয় তাই বলে ওঠে -

‘তবু কথা রাখেনি বরুনা, এখানে তার বুকে শুধুই সমাংসের গন্ধ
এখনো সে যে কোন নারী।’

এভাবেই স্বপ্ন ও স্বপ্ন ভঙ্গের মধ্য দিয়ে তেত্রিশ বছর কাটল কিন্তু

‘কেউ কথা রাখেনি, তেত্রিশ বছর কাটলো, কেউ কথা রাখেনা।’

এক চরম বিস্ময়ের ভিতর দিয়ে কবিতার পরিসমাপ্তি ঘটিয়েএন কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়।

কবি শেষ আশ্রয় নারী। তাঁর কাব্যে একাকিত্ব, বেদনা, হতাশা থাকলে ও নারী তাঁর আশ্রয়স্থল হয়ে উঠেছে। প্রেম তাকে দিয়েছে সুখ, একথা ঠিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রেম দেহ নির্ভর হলেও এ প্রেম যৌন সর্বস্ব নয়। তাঁর কাব্য নারী যমুনা, নীরা নামে স্থান পেয়েছে। কবির চোখে এই নারীরা কেমন ‘নারীর ভিতরে নারী’র একটা রূপ পাওয়া যায় -

‘...তুমি যৌবনের
প্রত্যেক কবির নীরা, দুনিয়ার সব দাপাদাপি ক্রুদ্ধ লো্য
ভুলও ঘুমের মধ্যে তোমার মাধুরী ছুঁয়ে নদীর তরঙ্গ
হয়, পাপীকে চুম্বন করো তুমি৯, তাই দ্বারা খোলে স্বর্গের প্রহরী....’

এ নারী চিরন্তন নারী, তাই কবির কাছে এই নারীর সংকট -

‘এ হাত ছুঁয়েছে নীরার মুখ,
এ হাতে - আমি কি কোন পাপ করতে পারি?’

প্রেমিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের রোমান্টিক প্রেমের প্রকাশ তা কাব্যে।

‘কেউ কথা রাখেনি’ কবিতাটি পাঠকের হৃদয় ছুঁয়ে যায়। আমাদের নিয়ে যায় স্মৃতির অতলে যেখানে কবিতা পাঠের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ভিতরকার আবেগের উত্থান পতন লক্ষ্য করি। চাওয়া না পাওয়ার দিন গুলি কত জীবন্ত তা সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়জীবন দিয়ে অনুভব করেছিলেন তাই কবিতায় জীবন পেল সেই সব স্মৃতি, শৈশব কৈশরে গাথা। আমাদের ছোটবেলার কত স্বপ্নতো ঝরে যায় রাতের আকাশের তারার মত। কবি এমন কিছু আশা ভঙ্গ ও

টিপ্পনী

স্বপ্নভঙ্গ ও না পাওয়ার কথা বললেন যা বিষাদের নরম স্পর্শ গ্রাস করে আমাদের।

আদর্শ প্রশ্নাবলী :

ক. 'কেউ কথা রাখেনি' কবিতায় কবির স্বপ্ন ভঙ্গের কথা আলোচনা কর।

খ. কবির ছোটবেলার স্মৃতিমেদুর জীবনের কথা বিষাদের স্পর্শ নিয়ে আসে, বর্ণনা কর।

গ. 'নাদের আলি, আমি আর কত বড় হব ? - কে এই নাদের আলি ? কেনই বা তার কাছে এ প্রশ্ন ?

ঘ. 'সেই রয়্যাল গুলি, সেই লাঠি - লজেন্স, সেই রাস - উৎসব
আমায় কেউ ফিরিয়ে দেবেনা।' -
এমন অনুভূতির কারন কি ? নিজের ভাষায় লেখ।

ঙ. 'ভালোবাসার জন্য আমি হাতের মুঠোয় প্রান নিয়েছি
দুরন্ত ষাঁড়ের চোখে বেঁধেছি লাল কাপড়' -
কাকে ভালোবাসার জন্য এ প্রান বাজীরাখা - আলোচনা কর।

টিপ্পনী

টিপ্পনী

শিক্ষার বাহন

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

টিপ্পনী

প্রয়োজনের দিক হইতে দেখিলেএ বিদ্যায় মানুষের কত প্রয়োজন সে কথা বলা বাহুল্য। অথচ সেদিক দিয়া আলোচনা করতে গেলে তর্ক ওঠে। চাষিকে বিদ্যাশিখাইলে তার চাষ করিবার শক্তি কমে কি না, স্ত্রীলোককে বিদ্যা শিখাইলে তার হরিভক্তি ও পতিভক্তির ব্যাঘাত হয় কি না এ সব সন্দেহের কথা প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায়।

কিন্তু দিনের আলোককে আমরা কাজের প্রয়োজনের চেয়ে আরও বড়ো করিয়া দেখিতে পারি, সে হইতেছে জাগার প্রয়োজন। এবং তার চেয়ে আরও বড়ো কথা, এই আলোতে মানুষ মেলে, অন্ধকারে মানুষ বিচ্ছিন্ন হয়।

জ্ঞান মানুষের মধ্যে সকলের চেয়ে বড়ো ঐক্য। বাংলাদেশের এক কোণে যে ছিল পড়াশুনা করিয়াছে তার সঙ্গে য়ুরোপের প্রান্তের শিক্ষিত মানুষের মিল অনেক বেশি সত্য, তার দুয়ারের পাশের মূর্খ প্রতিবেশির চেয়ে।

জ্ঞানে মানুষের এই যে জগৎজোড়া মিল বাহির হইয়া পড়া, যে মিল দেশভেদ ও কালভেদকে ছাড়াইয়া যায় - সেই মিলের পরম প্রয়োজনের কথা ছাড়িয়া দেওয়া যাক কিন্তু সেই মিলের যে পরম আনন্দ তাহা হইতে কোনো মানুষকেই কোনো কারণেই বঞ্চিত করিবার কথা মনেই করা যায় না।

সেই জ্ঞানের প্রদীপ এই ভারতবর্ষে কত বহু দূরে দূরে এবং কত মিটমিট করিয়া জ্বলিতেছে সে কথা ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারি ভারতবাসীর পক্ষে সেই পরম যোগের পথ কত সংকীর্ণ, যে যোগ জ্ঞানের যোগ, যে যোগে সমস্ত পৃথিবীর লোক আজ মিলিত হইবার সাধনা করিতেছে।

যাহা হউক, বিদ্যাশিক্ষার উপায় ভারতবর্ষে কিছু কিছু হইয়াছে। কিন্তু বিদ্যাবিস্তারের বাধা এখানে মস্ত বেশি। নদী দেশের একধার দিয়া চলে, বৃষ্টি আকাশ জুড়িয়া হয়। তাই ফসলের সব চেয়ে বড়ো বন্ধু বৃস্টি, নদী তার অনেক নীচে ; শুধু তাই নয়, এই বৃষ্টিধারার উপরেই নদীজলের গভীরতে, বেগ এবং স্থায়িত্ব নির্ভর করে।

কিন্তু আমাদের বিলাতি বিদ্যাটা কেমন ইস্কুলের জিনিস হইয়া সাইনবোর্ডে টাঙানো থাকে, আমাদের জীবনের ভিতরের সামগ্রী হইয়া যায় না। তাই পশ্চমের শিক্ষায় যে ভালো জিনিস

টিপ্পনী

আছে তার অনেকখানি আমাদের নোটবুকেই আছে ; সে কী চিন্তায়, কী কাজে ফলিয়া উঠিতে চায় না।

আমাদের দেশের আধুনিক পণ্ডিত বলেন, ইহার একমাত্র কারণ জিনিসটা বিদেশী। এ কথা মানি না। যা সত্য তার জিয়োগ্রাফি নাই। ভারতবর্ষও একদিন যে সত্যার দীপ জ্বালিয়াছে তা পশ্চিম মহাদেশকেও উজ্জ্বল করিবে, এ যদি না হয় তবে ওটা আলোই নয়। বস্তুত যদি এমন কোনো ভালো থাকে যা একমাত্র ভারতবর্ষেরই ভালো তবে তা ভালোই নয় এ কথা জোর করিয়া বলিব। যদি ভারতের দেবতা ভারতেই হন তবে তিনি আমাদের স্বর্গের পথ বন্ধ করিবেন কারণ স্বর্গ বিশ্বদেবতার।

আসল কথা, আধুনিক শিক্ষা আর বাহন পায় নাই - তার চলাফেরার পথ খোলসা হইতেছে না। এখনকার দিনে সর্বজনীন শিক্ষা সকল সভ্য দেশেই মানিয়া লওয়া হইয়াছে। যে কারণেই হউক আমাদের দেশে এটা চলিল না। মহাত্মা গোখলে এই লইয়া লড়িয়াছিলেন। শুনিয়াছি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের কাছ হইতেই তিনি সব চেয়ে বাধা পাইয়াছেন। বাংলাদেশে শুভুদ্ধির ক্ষেত্রে আজকাল হঠাৎসকল দিক হইতেই একটা অদ্ভুত মহামারীর হাওয়া বহিয়াছে। ভূতের পা পিছন দিকে, বাংলাদেশে সামাজিক সকল চেষ্টারই পা পিছনে ফিরিয়াছে। আমরা ঠিক করিয়াছি সংসারে চলিবার পথা আমরা পিছন মুখে চলিব, কেবল রাষ্ট্রীয় সাধনার আকাশে উড়িবার পথে আমরা সামনের দিকে উড়িব, আমাদের পা যেদিকে আমাদের ডানা ঠিক তার উল্টো দিক গজাইবে।

যে সর্বজনীন শিক্ষা দেশের উচ্চশিক্ষার শিকড়ে রস জিগাইবে কোথাও তার সাড়া পাওয়া গেল না, তার উপরে আবার আর - এক উপসর্গ জুড়িয়াছে। এক দিকে আসবাব বাড়াইয়া অন্য দিকে স্থান কমাইয়া আমাদের সংকীর্ন উচ্চশিক্ষার আয়তনকে আরও সংকীর্ণ করা হইতেছে। ছাত্রের অভাব ঘটুক কিন্তু সরঞ্জামের অভাব না ঘটে সে দেকে কড়া দৃষ্টি।

বিদ্যাবিস্তারের কথাটা যখন ঠিকমত মন দিয়া দেখি তখন তার সর্বপ্রধান বাধাটা এই দেখিতে পাই যা, তার বাহনটা ইংরেজি। বিদেশী মাল জাহাজে করিয়া শহরের ঘাট পর্যন্ত আসিয়া পৌঁছিতে পারে কিন্তু সেই জাহাজকটাতে করিয়াই দেশের হাটে আমদানি রপ্তানি করাইবার দুরাশা মিথ্যা। যদি বিলিতি জাহাজটাকেই কায়মনে আঁকড়াইয়া ধরিতে চাই তবে ব্যাবসা শহরেই আটকা পড়িয়া থাকিবা।

এ পর্যন্ত এ অসুবিধাটাকে আমাদের অসুখ বোধ হয় নাই। কেননা মুখে যাই বলি মনের মধ্যে এই শহরটাকেই দেশ বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিলাম। দাক্ষিণ্য যখন খুব বেশি হয় তখন এই পর্যন্ত বলি, আচ্ছা বেশ, খুব গোড়ার দিকের মোটা শিক্ষাটা বাংলা ভাষায় দেওয়া চলিবে কিন্তু সে যদি

উচ্চশিক্ষার দিকে হাত বাড়ায় তবে গমিষ্যত্যুপহাস্যতাম্।

আমাদের এই ভীরুতা কি চিরদিনই থাকিয়া যাইবে ? ভরিসা করিয়া এটুকু কোনোদিন বলিতে পারিব না যে, উচ্চশিক্ষাকে আমাদের দেশের ভভাষায় দেশের জিনিস করিয়া লইতে হইবে ? আমরা ভরসা করিয়া এ র্যন্ত বলিতেই পারিলাম না যে, বাংলাভাষাতেই আমরা উচ্চশিক্ষা দিব এবং দেওয়া যায়, এবং দিলে তবেই বিদ্যার ফসল দেশ জুড়িয়া ফলিবে।

আমাদের ভরসা এতই কম যে, ইস্কুল - কলেজের বাহিরে আমরা যে - সব লোকশিক্ষার আয়োজন করিয়াছি সেখানেও বাংলা ভাষার প্রবেশ নিষেধ। বিজ্ঞানশিক্ষাবিস্তারের জন্য দেশের লোকের চাঁদায় বহুকাল হইতে শহরে এক বিজ্ঞানসভা খাড়া দাঁড়াইয়া আছে। প্রাচ্যদেশের কোনো কোনো রাজার মতো গৌরবনাশের ভয়ে জনসধারণের কাছে সে বাহির হইতেই চায় না। বরং অচল হইয়া থাকিবে তবু কিছুতেসে বাংলা বলিবে না। ও যেন বাঙালির চাঁদা দিয়া বাঁধানো পাকা ভিতের উপর বাঙলির অক্ষমতা ও উদাসিন্যের স্মরণস্তম্ভের মতো স্থাণু হইয়া আছে। কথাও বলে না, নড়ে না। উহাকে ভুলিতেও পারি না, উহাকে মনে রাখাও শক্ত। ওজর এই যে, বাংলাভাষায় বিজ্ঞানশিক্ষা অসম্ভব। ওটা অক্ষমের ভীরুর ওজর। কঠিন বৈকি, সেইজন্যেই কঠোর সংকল্প চাই। একবার ভাবিয়া দেখুন, একে ইংরেজি তাতে সায়ান্স্ তার উপরে, দেশে যে - সকল বিজ্ঞান বিশারদ আছেন তাঁরা জগদ্‌বিখ্যাত হইতে পারেন কিন্তু দেশের কোণে এই যে একটুখানি বিজ্ঞানের নীড় দেশের লোক বাঁধিয়া দিয়াছে এখানে তাঁদের ফলাও জায়গা আই, এমন অবস্থায় এই পদার্থটা বঙ্গসাগরের তলায় যদি ডুব মারিয়া বসে তবে ইহার সাহায্যে সেখানকার মৎস্যশাবকের বৈজ্ঞানিক উন্নতি আমাদের বাঙালির ছেলের চেয়ে যে কিছুমাত্র কম হইতে পারে এমন অপবাদ দিতে পারব না।

মাতৃভাষা বাংলা বলিয়াই কি বাঙালিকে দন্ড দিতেই হইবে ? এই অজ্ঞানকৃত অপরাধের জন্য সে চিরকাল অজ্ঞান হইয়া থাক - সমস্ত বাঙালির প্রিয় কয়জন শিক্ষিত বাঙালির এই রায়ই কি বহাল রহিল ? যে বেচারা বাংলা বলে সেই কি আধুনিক মনুসংহিতার শূদ্র ? তা কানে উচ্চশিক্ষার মন্ত্র চলিবে না ? মাতৃভাষা হইতে ইংরেজি ভাষার মধ্যে জন্ম লইয়া তবেই আমরা দ্বিজ হই ?

বলা বাহুল্য ইংরেজি আমাদের শেখা চাইই - শুধু পেটের জন্য নয়। কেবল ইংরেজি কেন ? ফরাসি জর্মান শিখিলে আরও ভালো। সেইসঙ্গে এ কথা বলাও বাহুল্য অধিকাংশ বাঙালি ইংরেজি শিখিবে না। সেই লক্ষ লক্ষ বাংলাভাষীদের জন্য বিদ্যার অনশন কিংবা অর্ধাসনই ব্যবস্থা, এ কথা কোনমুখে বলা যায়।

দেশে বিদ্যাশিক্ষার যে বড়ো কারখানা আছে তার কলের চাকার অল্পমাত্র বদল করিতে গেলেও বিস্তর হাতুড়ি - পেটাপেটি করিতে হয় - সে খুব শক্ত হাতের কর্ম। আশু মুখুজ্যে মশায়

টিপ্পনী

টিপ্পনী

ওরই মধ্যে এক-জায়গায় একটুখানি বাংলা হাতল জুড়িয়া দিয়াছেন।

তিনি যেটুকু করিয়াছেন তার ভিতরকার কথা এই, বাঙালির ছেলে ইংরেজি বিদ্যায় যতই পাকা হোক বাংলা না শিখিলে তার শিক্ষা পুরা হইবে না। কিন্তু এ তো গেল যারা ইংরেজি জানে তাদেরই বিদ্যাকে চৌকশ করিবার ব্যবস্থা। আর, যারা বাংলা জানে ইংরেজি জানে না, বাংলার বিশ্ববিদালয় কি তাদের মুখে তাকাইবে না? এতবড়ো অস্বাভাবিক নির্মমতা ভারতবর্ষের বাহিরে আর কোথাও আছে?

বাংলার বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি এবং বাযলা ভাষার ধারা যদি গঙ্গাযমুনার মতো মিলিয়া যায় তবে বাঙালি শিক্ষার্থীর পক্ষে এটা একটা তীর্থস্থান হইবে। দুই স্রোতের সাদা এবং কালো রেখার বিভাগ থাকিবে বটে কিন্তু তারা একসঙ্গে বহিয়া চলিবে। ইহাতেই দেশের শিক্ষা যথার্থ বিস্তীর্ণ হইবে, গভীর হইবে, সত্য হইয়া উঠিবে।

ভালো মতো ইংরেজি শিখিতে পারিল না এমন ঢের ঢের ভালো ছেলে বাংলাদেশে আছে। তাদের শিখিবার আককাঙ্খা ও উদ্যমকে একেবারে গোড়ার দিকেই আটক করিয়া দিয়া দেশের শক্তির কি প্রভুত অপব্যায় করা হইতেছে না?

আমার প্রশ্ন এই, প্রেপারেটরি ক্লাস পর্যন্ত একরকম পড়াইয়া তারপর বিশ্ববিদালয়ের মোড়টার কাছে যদি ইংরেজি বাংলা দুটো বড়ো রাস্তা খুলিয়া দেওয়া যায় তা হইলে কি নানাপ্রকারে সুবিধা হয় না? এক তো ভিড়ের চাপ কিছু কমেই, দ্বিতীয়ত শিক্ষার বিস্তার অনেক বাড়ে।

ইংরেজি রাস্তাটার দিকেই এশি লোক ঝুঁকিবে তা জানি; এবং দুটো রাস্তার চলাচল ঠিক সহজ অবস্থায় পৌঁছতে কিছু সমও লাগিবে। রাজভাষার দর বেশি সুতরাং আদরও বেশি। কেবল চাকরির বাজারে নয়, বিবাহের বাজারেও বরের মূল্যবৃদ্ধি ঐ রাস্তাটাতেই। তাই হোক - বাংলা ভাষা অনাদর সহিতা রাজি, কিন্তু অকৃতার্থতা সহ্য করা কঠিন। ভাগ্যমন্তের ছেলে ধাত্রীস্তন্যে মোটাসোটা হইয়া উঠুক - না কিন্তু গরিবের ছেলেকে তার মাতৃস্তন্য হইতে বঞ্চিত করা কেন?

আমি জানি তর্ক এই উঠিবে তুমি বাংলা ভাষার যোগে উচচশিক্ষা দিতে চাও কিন্তু বাংলাভাষায় উঁচুদরের শিক্ষাগ্রন্থ কই? নাই সে কথা মানি কিন্তু শিক্ষা না চলিলে শিক্ষাগ্রন্থ হয় কী উপায়ে? শিক্ষাগ্রন্থ বাগানের গাছ নয় যে, শৌখিন লোকে শখ করিয়া তার কেয়ারি করিবে, কিংবা সে আগাছাও নয় যে মাঠে - বাটে নিজের পুলকে নিজেই কন্টকিত হইয়া উঠিবে! শিক্ষাকে যদি শিক্ষাগ্রন্থের জন্য বসিয়া থাকিতে হয় তবে পাতার জোগাড় আগে হওয়া চাই তারপরে গাছের পালা এবং কূলে পথ চাহিয়া নদীকে মাথা হাত দিয়া পড়িতে হইবে।

বাংলায় উচ্চ - অঙ্গের শিক্ষাগ্রন্থ বাহির হছে না এটা যদি আক্ষেপের বিষ হয় তবে তার প্রতিকারের একমাত্র উপায় বিশ্ববিদ্যালয়ে আংলায় উচ্চ - অঙ্গের শিক্ষা প্রচলন করা। বঙ্গসাহিত্যপরিষৎ কিছুকাল হইতে এই কাজের গোড়াপত্তনের চেষ্টা করিতেছেন। পরিভাষা রচনা ও সংকলনের ভার পরিষৎ লইয়াছেন, কিছু কিছু করিয়াছেন। দেশে এই পরিভাষা তৈরির তাগিদ

কোথায় ? ইহার ব্যবহারের প্রয়োজন বা সোযোগ কই ? দেশে টাকা চলিবে না অথচ টাঁকশাল চলিতেই থাকিবে এমন আবদার করি কোন্ লজ্জায় ?

জার্মানিতে ফ্রান্সে আমেরিকায় জাপানে যে সকল আধুনিক বিশ্ববদ্যালয় জাগিয়া উঠিয়াছে তাদের মূল উদ্দেশ্য সমস্ত দেশের চিত্তকে মানুষ করা। দেশকে তারা সৃষ্টি করিয়া চলিতেছে। বীজ হইতে অঙ্কুরকে, অঙ্কুর হইতে বৃক্ষকে তারা মুক্তিদান করিতেছে। মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিকে চিত্তশক্তিকে উদঘাটিত করিতেছে।

দেশের এই মনকে মানুষ করা কোনোমতেই পরের ভাষায় সম্ভবপর নহে। আমরা লাভ করিব কিন্তু সে লাভ আমাদের ভাষাকে পূর্ণ করিবে না, আমরা চিন্তা করিব কিন্তু সে চিন্তার বাহিরে আমাদের ভাষা পড়িয়া থাকিবে, আমাদের মন বাড়িয়াচলিবে সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ভাষা বাড়িতে থাকিবে না, সমস্ত শিক্ষাকে অকৃতকার্য করিবার এমন উপায় আর কী হইতে পারে।

লেখক পরিচিতি : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর [১৮৬১ - ১৯৪১]

দেবেন্দ্রাথের সুযোগ্য সন্তান, বাংলা তথা সমগ্র ভারতের সাহিত্য কাশে এক ধ্রুবতারা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। প্রাতিস্ঠানিক শিক্ষার প্রতি তার আকর্ষন না থাকলেও ওরিয়েন্টাল সেমিনারি, নর্মাল স্কুল, বেঙ্গল একাডেমি, সেন্ট জেভিবার্স স্কুলে কিছুদিনের জন্য ভর্তি হতে দেখা যায়। ঠাকুরবাড়ির সংস্কৃতির বাতাবরনে তাঁর বেড়ে ওঠা। ছোট থেকেই সাহিত্যের প্রতি তার আকর্ষণ ও অনুরাগ। কাব্য কবিতা, গল্প - উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ, সকল বিষয়ে তার যাতাযাত ছিল অবাধ। ১৯১৩ সালে গীতাঞ্জলি তাঁকে বিশ্বখেতাবের জয় মুকুট পরিয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ 'কবিকাহিনী' থেকে সোনারতরী, মানসী, খেয়া, গীতাঞ্চগজলি, পুনশ্চ, আরোগ্য, শেষলেখা সৃষ্টি করলেন। রাজর্ষি, চোখের বালি, ঘরে বাইরের মত উপন্যাস এবং রূপক সাংকেতক নাটক গুলিও বিশ্বসাহিত্যে সবতর সৃষ্টি । প্রবন্ধ সাহিত্যকেও তাঁর বিপুল সম্ভার আমাদের বিস্ময় উদ্রেক করে। প্রবন্ধ গ্রন্থগুলুকে বিভিন্ন পর্যায়ে ভাগ করা যেতে পারে, যেমন - শিক্ষা - সমাজ - রাজনীতি বিষয়ক। ধর্ম ও দর্শন মূলক।সাহিত্য সমালোচনা, ব্যাক্তিগত, জীবনী ভ্রমনকথা ও পত্রসাহিত্য। বিখ্যাত প্রবন্ধ গ্রন্থগুলি হল আত্মশক্তি (১৯০৫), ভারতবর্ষ, শিক্ষা (১৯০৮) সমাজ, ধর্ম, মানুষের ধর্ম (১৯৩৩), কালান্তর (১৯৩৭) আধুনিক সাহিত্য, লোকসাহিত্য, সাহিত্যের পথে, পঞ্চভূত, জাভা যাত্রীর পত্র, জীবনস্মৃতি, পথের সঞ্চয় প্রভৃতি। তিনি সমস্ত ওনের আকার কবি - সাহিত্যিক, সমালোচক শুধু নন, ততবড় সুরের সাধক ও। তাই শুধু কবি রবীন্দ্রনাথ নন, তিনি মৃতুহীন কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে গেছেন বিশ্বসাহিত্যে।

টিপ্পনী

টিপ্পনী

পাঠ পর্যালোচনা :

কাব্য কবিতা, গল্প, উন্যাস, নাটকের পাশাপাশি প্রবন্ধ সইত্যে নতুন পথের দিশারী বীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১ - ১৯৪১)। সাহিত্যের সকল শাখায় সোনার ফসল ফলিয়েছেন তিনি। শিল্প, সাহিত্য সমালোচনা, রাষ্ট্র ও সমাজ বিষয়ক আলোচনা ধর্ম বিষয়ক, শান্তিনিকেতন, বিখ্যাত মানুষের ধর্ম, বিঞ্জান, জীবনী ও শিক্ষা বিষয়ক গ্রন্থগুলি আকরগ্রন্থ হয়ে উঠেছে। সমকাল ও বর্তমানের প্রেক্ষিতে তাঁর বিশেষ জ্ঞান আমাদের অভিভূত করে।

'শিক্ষার আহন' প্রবন্ধটি চয়নকরা হয়েছে রবীন্দ্রনাএর - শিক্ষা (১৯০৮) প্রবন্ধ গ্রন্থ থেকে। কৃত্রিম বিজাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তে জাতীব প্রাণযুক্ত শিক্ষা বভবস্থা প্রতি তাঁর ছিল প্রগার অনুরাগ। জিবনের সঙ্গে শিক্ষার মেলবন্ধন না ঘটলে তা একটা করখানা হতে পারে প্রকৃত শিক্ষা হতে পারে না। শিক্ষা ব্যবস্থার যান্ত্রিকতা ও ক্রটিপূর্ণ ব্যবস্থা বিষয়ে অভিমত :

'ইস্কুল বলিতে আমরা যাহা বুঝি একটা শিক্ষা দিবার কল, ... পরীক্ষার সময় এই বিদার যাচাই হইয় তাহার উপর মার্কা পড়িয়া যায়।'

লিপিকার (১৯২২) তোতা কাহিনীতে শিক্ষা ব্যবস্টার আয়োজন, বিস্তর থাকলেও শুকনো পুঁথি গলাধ : করনের ফলে তোতার যে অবস্থা আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার ও সেই অবস্থা। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা যেন সেই যূপকাঠে বাঁধা তাতে এই প্রাণের দক্ষিণা বাতাস। 'শিক্ষার বাহন' প্রবন্ধে রবীন্দরনাথ শিক্ষা ব্যবস্থা দুর্বলতার স্থান গুলি যেমন তুলে ধরলেন তেমনি উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বাংলা ভাষা অর্থাৎ মাতৃভাষা সংকলনের পক্ষে মত দিয়েছেন।

মানুষের আভ্যন্তরীন মনুষ্যত্ব বিকাশের নাম শিক্ষা। তিনি শিক্ষার ব্যপক পরিধির কথাই বলেছেন। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মুক্ত জীবন বিকাশের ধারাই প্রকৃত শিক্ষা। যা ভারতীয় উপনাষিক যুগ থেকে যে প্রকৃতি সান্নিধ্যের মধ্য দিয়ে শিক্ষা ব্যবস্থা চলে এসেছে তা মাতৃভাষার মধ্যদিয়ে সমপন্ন হলে প্রকৃত শিক্ষা সম্ভব। যার সঙ্গে শুধু বাহ্যিক নয় অন্তরের নিবিড় সম্পর্ক বর্তমান। কৃত্রিম বিজাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি তাঁর আস্থা দেখা যায়নি। মাতৃভাষা মাতৃদুগ্ধ সমান। সেই শিক্ষার সঙ্গে আমাদের নাড়ীর যোগ। শিকআ দানের কৃত্রমতা কে তিনি আমল দেননি তাই শান্তিনিকেতনে আন্ত্রমিক বিদ্যালয় স্থাপন করলেন। পরে শিক্ষার বিশ্বব্যাপী প্রচেষ্টা বিশ্বভারতীর রূপ পরিগ্রহ করল। এবং হাতে কলমে শিক্ষার জ্য শ্রীনিকেতন গড়লেন।

আমাদের প্রকৃত শিক্ষা কিভাবে সম্ভব তা নিয়ে রবীন্দ্রনাথের চিন্তার অন্ত নেই, 'শিক্ষা' গ্রন্থই তার প্রমাণ। 'শিক্ষার সাঙ্গীকর' 'শিক্ষার বিকিরন', 'শিক্ষার বাহন' প্রভৃতি প্রবন্ধে তার মস্তিষ্ক প্রসূত শিক্ষা সংক্রান্ত মূল্যবান কথা লিপিবদ্ধ করেছেন। আলোচ্য 'শিক্ষার বাহন' প্রবন্ধে

উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বাংলাভাষার অগ্রাধিকারের কথা বলা হয়েছে। বিশ্ব বিদালয় স্তরে ইংরেজির মধ্যদিয়ে পড়াশুনা চলত। কবিগুরু উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে ইংরেজি এবং বাংলা ভাষা দুটো রাস্তাই খুলে রাখার পক্ষে বললেন এ সম্পর্কে 'শিক্ষার বাহন' প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক জানালে -

'বাংলার বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি এবং বাংলা ভাষার ধারা যদি গঙ্গা যমুনার মতো মিলিয়া যায় তবে বাঙালি শিক্ষার্থীর পকএ এটা একটা তীর্থস্থান হইবে।'

বিদ্যার প্রয়োজন আমাদের অপরিহার্য। বিদ্যাকে সকল স্তরে পৌঁছে দেওয়াই আমাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য, শিক্ষাই মানুষ কে আলোর জগতে যুক্ত বিহঙ্গের উড়ান সম্ভব। জ্ঞানের শক্তিতে অন্ধকার বিদূরিত হয়, জ্ঞান কত শক্তিশালী ঐক্য বোঝাতে জানালেন -

'বালাদেশের এক কোনে যে ছেলে পড়াশুনা করিয়াছে তার সঙ্গে য়ুরোপেরে প্রান্তরে শিক্ষিত মানুষের মিল অনেক বেশি সত্য, তার দুয়ারের পাশের মুর্খ প্রতিবেশীর চেয়ে।'
প্রকৃত শক্তিশালী জাতিগঠনে বিদ্যাশিক্ষা জরুরী। আধুনিক শিক্ষাকেযারা কটাক্ষ করে বলেন সমাজ যায় যায় সে কূপমন্ডুক ; সেই আধমরাদের ঘা দিয়ে লিখলেন -

'চাষিকে বিদ্যা শিখাইলে তার চাষ করিবার শকতি কমে কিনা, স্ত্রীলোককে বিদ্যা শিখাইলে তার হরিভক্তি ও পতিভক্তির ব্যাঘাত হয় কিনা এ সব সন্দেহের কথা প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায়।'

প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথ মনে করে মানুষের সঙ্গে মানুষের মেল বন্ধন ঘটাতে পারে জ্ঞান, যার মধ্যে দেশ - কালের, ভেদরেখা থাকে না। ইউরোপ ও রাশিয়া ভ্রমন করে রবীন্দনাথ সে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা অবলোকন করেছিলেন, যা তার হৃদয়ে আলোড়ন তুলেছিল, সেই অভিজ্ঞতার সঙ্গে ভারতবর্ষের শিক্ষার অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে 'শিক্ষার বাহনে' জানালেন -

> 'সেই জ্ঞানের প্রদীপ এই ভারতবর্ষে কতদূরে দূরে এবং কত মিট মিট করিয়া জ্বলিতেছে যে কথা ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারি ভারতবাসীর পক্ষে সেই পরম যোগের পথ কত সংকীর্ন, যে যোগ জ্ঞানের যোগ, যে যোগে সমস্ত পৃথিবীর লোক আজ মিলিত হিবার সাধনা করিতেছে।'

আমাদের দেশে যে শিক্ষার ব্যবস্থা শুরু হয়ে তা জানিয়ে বিদ্যাবিস্তারে বাধার কথা জানিয়েছেন। বিজাতীয় শিক্ষার অন্তঃসার শূন্যতাকে তিনি স্কুলের সামগ্রী হয়ে সাইনবোর্ড হওয়ার কথা বলে মনে করেছেন। তা জীবনের কাজের জিনিস হয়ে ওঠেনি তা বাইরের সামগ্রী হয়ে রয়েছে।

ইংরেজি আমাদের বাইরের সামগ্রী হয়ে আছে তাকে অন্তরের করতে পারিনি।

টিপ্পনী

টিপ্পনী

পশ্চমের শিক্ষায় যা ভালে তাকে গ্রহন করতে হবে কোন সূৎমার্গ রাখলে চলবে না এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের গভীর প্রজ্ঞাজনিত উক্তি 'যা সত্য তার জিয়োগ্রাফি নাই।' এই শিক্ষার আলে সকল দেশের তা সমস্ত পৃথিবীর। এই সত্য ভালো বিশ্বজনীন। একথা বোঝাতে স্বর্গ শুধু আমাদের নয় কারণ 'স্বর্গ বিশ্বদেবতার।' শিক্ষা ব্যবস্থার এমন বেহাল অবস্থার কারন 'আধুনিক শিক্ষা তার বাহন পায় নাই - তার চলাফেরার পথ খোলসা হইতেছে না।' আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা যে ভাবে গ্রহন করার প্রয়োজন তা করে আমরা তার উল্টো পথে হেঁটে চলেছি। তাকে অন্তরের সঙ্গে গ্রহন করতে পারিনি। মাতৃ ভাষার পাশাপাশি বিদেশী ইংরেজী ভাষাকে কাজের ভাষা করে তুলতে হবে। তার বিস্তৃত স্থান চাই, চাপিয়ে দেওয়া, কারখানার শিক্ষা ব্যবস্থা হলে চলবে না।

আমদের দেশে বিদ্যাবিস্তারের প্রধান বাধাটা হল বাহন ইংরেজি। যা শউরে শিক্ষার ব্যবস্থার মধ্যে সীমাবদ্ধ। সর্বজনীন শিক্ষার জন্য মাতৃভাষার উপরে জোর দিতে হবে। তবে উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা ও বাংলায় দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। বাংলায় বিজ্ঞান ও উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে জ্ঞান চর্চার বই নেই, এটাকে আমাদের অক্ষমতার প্রকাশ। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বাংলা কি অবছুৎ হয়ে থাকবে। মাতৃভাষা বাংলা হওয়ার জন্যই কি আমাদের এই দন্ড। আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যম ইংরেজি হওয়ায় বাংলা বলা বাঙালির অবস্থা সম্পর্কে বলা হয়েছে -

> 'যে বেচারা বাংলা বলে সেই কি আধুনিক মনুসংহতির শুদ্র " তার কানে উচ্চ শিক্ষার মন্ত্র চলিবে না? মাতৃআষা হইতে ইংরেজি ভাষার মধ্যে জন্ম লইয়া তবেই আমরা দ্বিজ হই?

প্রসঙ্গ ক্রমে আশুতোষ মুকার্জীর বিদ্যাশিক্ষার বাংলা হাতল জোড়ার কথা তুলেছেন প্রবন্ধকার। মুখার্জী যা করেছেন তার আঁতের কথা বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ তার বিখ্যাত শিক্ষা বিষয়ক প্রবন্ধে বললেন - বাঙালি যত সিদ্ধহস্ত হোক বাংলা না শিখলে তা সম্পূর্ন হয় না। আসলে এটাকে যারা ইংরেজি জানে তাদের চৌখস করার ব্যবস্থা। আর যারা ইংরেজি জানে না বাংলার বিশ্ববিদ্যালয় তাদের দিকে কি মনুখ তুলে তাকাবেন ? এ প্রশ্ন তুলেছেন। এমন সামঞ্জস্যহীন শিক্ষা ব্যবস্থা ভারতবর্ষের বাইরে কোথাও নেই। সামঞ্জস্যযুক্ত শিক্ষা ব্যবস্থার কথা বলতে গিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে ইরেজি ও বাংলার যুগ্ম ধারার প্রবাহের কথা বলেছেন।

আমাদের দেশে অননেক সুসন্তান আছে যারা ইংরেজি শিখতে পারেনি বলে তাদের শিখবার আকাঙ্খা ও উদ্যোমকে ধ্বংস করা হচ্ছে। প্রবন্ধকার প্রশ্ন তুলেছেন এই ব্যবস্থা - 'দেশের শক্তির কি প্রভূত অপব্যায় করা হইতেছে না ?' বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে ইংরেজি ও বাংলা দুটো বড় রস্তাই খুলে রেখে বিদ্যাশিক্ষার আয়োজন প্রয়োজন। শুধু পরকাঠামোর উন্নয়ন নয় প্রকৃত শিক্ষার জন্য উপযুক্ত শিক্ষাগ্রন্থ রচনা করে বাংলা ভাষায় এ ব্যবস্থা করতে হবে। মানবসম্পদের উন্নয়নই মূল লক্ষ্য তাই জার্মানে, ফ্রান্সে, আমেরিকা, জাপানে যে আধুনিক

শিক্ষা প্রচলন হয়েছে তার মূল উদ্দেশ্য -

'সমস্ত দেশের চিত্তকে মানুষ করা।' তাদের দেশে শিক্ষার বীজ হতে বৃক্ষে পরিনত হওয়ার যুক্তি আছে আছে - 'মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিকে চিত্তশক্তিকে উদঘাটিত করিতেছি। আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার অসারতার দিকটিকে তিনি 'শিক্ষার বাহনে' তুলে ধরলেন' শিক্ষা ব্যবস্থার 'গোড়ার গলদ' চোখে আঙুল দিয়ে তিনি দেখালেন বর্তমান প্রবন্ধ।

আদর্শ প্রশ্নমালা :

ক. 'শিক্ষার বাহন' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের প্রতিপাদ্য বিষয় সম্পর্কে যা জানো লেখ।

খ. উচ্চ শিক্ষায় ইংরেজির পাশাপাশি বাংলাভাষায় সম্ভব কিনা, সে সম্পর্কে প্রবন্ধকারে বক্তব্য জানাও।

গ. 'আধুনিক শিক্ষা তার বাহন পায় নাই' - বক্তব্য তাৎপর্য নিরুপন কর।

ঘ. 'মাতৃভাষা বাংলা বলিয়াই কি বাঙালিকে দন্ড দিতেই ইবে?' - রবীন্দরনাথের বক্তব্য পরিস্ফুট কর।

ঙ. 'তাদের মূল উদ্দেশ্য সমস্তদেশের চিত্তকে মানুষ করা।' - কাদের কথা বলা হয়েছে? তাদের শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য আলোচনা কর।

টিপ্পনী

টিপ্পনী

বাংলার সংস্কৃতি

দীনেশচন্দ্র সেন

টিপ্পনী

শহর ও নগরে যেরূপ গাঙ্গের উজান ও ভাঁটি, উলট - পালট ও পরিবর্ত্তন, বঙ্গের পল্লীতে তাহা নাই। বঙ্গের পল্লী সেদিনও ছিল আম, জাম, কাঁঠাল - তরুর ছায়াশীতল, সেখানকার কুঁড়ে ঘর গোময়লিপ্ত,অতি পরিচ্ছন্ন আঙ্গিনা, সেদিন পর্য্যন্তও তাহাতে একটা ছুঁচ পড়িলে রাত্রে কুড়াইয়া তুলিতে পারা যাইত ; কারণ সেখানে বাঙ্গলার ঋতুভেদে সোনার ফসল আনিয়া মজুত করা হইত। সেদিন পর্য্যন্ত বাঙ্গলার মন্দির কারুকার্য্য - মন্ডিত ছিল, সেখানে দেবতারা নিত্যভোগ পাইতন, প্রসাদ পাইবার জন্য ছেলে - বুড়ো জড় হইত, সেখানে অতিথি ফিরিত না। মেয়েরা চরকা ছাড়িত না, তাহাদের সমস্ত শিল্পভৈপুণ্য দিয়া যে সন্দেশ তৈরী করিত, তাহাতে ফুল ও ফলের সমস্তর শোভা পএদর্শিত হইত, তাহাদের সেলাই এক একখানি কাঁথা পারস্যের কার্পেটের মত হইত। তাহাদের আলপনা ও পিঁড়িচিত্র দেখিলে লোকে মুগ্ধ হইয়া তাকাইয়া থাকিত। তাহাদের শিকা, পানের আটা, পুঁথির লাঠি দেখিয়া সকলে বিমোইত হইত। পল্লীর সূত্রধর কাঠের মধ্যে যে সকল ছবি আঁকিত এবং পল্লির মিস্ত্রি পাড়া ইটের উপর যে সকল ফুল লতা ও নরনারীর মূর্ত্তি উৎকীর্ণ করিত এবং পুঁথির মলাটে যে ছবি আঁকিত তাহার বিস্ময়কর সৌন্দর্য দেখিয়া এখনও লোকে মুগ্ধ হইয়া থাকে ; পল্লীর হালুইকরের হাতে মিছরির খেলনা, নারিকেলের শাঁস দিয়া এরূপ ময়ূর গঠিত হইত, যাহার ডানা পাখা ও লেজে ইন্দ্রধনুর বিচিত্রবর্ণ খেলা করিত। মৌর্য, গুপ্ত ও পাল - রাজত্বকে স্মরণ করাইয়া দিবার মত শিল্প - সম্ভার গ্রামবাসীরা আয়ত্ত করিয়াছিল, তাহা হিন্দুর সভ্যতার বিচিত্র আসবাব ও ধারা বজায় রাখিয়াছিল। তাঁহারাই জগজ্জয়ী কীর্ত্তনগানের স্রষ্টা, গ্রামের টোলের পণ্ডিতগণ সর্ব্বশাস্ত্রে বুৎপত্তি লাভ করিয়া জগদ্‌গুরু উপাধি লাভ করিতেন এবং নটগন নর্ত্তনে এরূপ চিরাগত পটুতা প্রদর্শন করিত যে গুরুসদয় দত্ত মহাশয়ের মত পণ্ডিত ও সমালোচক সেউ নর্ত্তনের আবে বিভোর হইয়া গিয়াছেন। তিনি সমস্ত য়ুরোপীয় নৃত্য ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছেন এবং বলিয়া থাকেন যে বঙ্গের পল্লীর রাঁইবেশে, বাউল, জারি, দশবতা নৃত্যের যেরূপ বিজ্ঞানানুগ অঙ্গভঙ্গী ও সৌষ্ঠব - তাহাতে ইহাদের এই নৃত্য জগতে প্রথম শ্রেণীতে স্থান পাইবার যোগ্য, এবং ইহা সেই প্রাচীন শিবতান্ডব ও মহাভারতীয় যুগের বৃহন্নলার নাট্য - ধারা বজায় রাখিয়াছে।

বড় বড় স্থাপত্য ও অপরাপর কলাশিল্পে ভারতের স্থান পূর্ব্ববর্ত্তী ছিল। এ সকল শিল্প রাজানুগ্রহে শ্রীসম্পন্ন হয়। যুধিষ্ঠিরের যে রাজসভা ময়দানব নির্ম্মাণ করিয়াছিল, চন্দ্রগুপ্তের রাজধানীর ঐশ্বর্য্য, কারুকার্য্য ও স্থপতিবিদ্যার পরাকাষ্ঠ দেখিয়া গ্রীকদূত মেগাস্থিনিস উহা পারস্যের বিশ্ববিশ্রুত রাজধানীর গৌরবকেও হীন করিয়াছিলেন, অশোকের যে বিশাল রাজপূরীর

টিপ্পনী

ভগ্ননিদর্শন দেখিয়া স্থপতিবিদ্যাবিশারদেরা সেই পুরাকালে এরূপ শিল্পদক্ষতা কিরূপে হইল সেই সমস্যা পূরণ করিতে অক্ষম হইয়াছেন, নালন্দার মন্দিদার যে কারুকার্য্য দেখিয়া কানিংহামের মত শ্রেষ্ঠসমালোচক বলিয়াছেন, জগতে তিনি সেরূপ স্থাপত্য ও চারুশিল্পের এরূপ বিরাট্ নিদর্শন কোথায়ও দেখেন নাই, মথুরার সমৃদ্ধি ও স্বর্ণ - রৌপের অসংখ্য দেবমূর্ত্তির যে আশ্চর্যগঠনপ্রণালী ও শিল্পকৃতিত্ব দেখিয়া মুসলমান ঐতিহাসিকগণ বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন, তাহা ছাড়া ইলোরা - অজন্তার অপূর্ব স্থাপত্য ও চিত্রশিল্প - দূর যবদ্বীপে বিরাট্ বরোবদর মন্দির - বহু দৌরাত্ম, ধ্বংস ও ক্ষয়ের পরও এই যে ভারতীয় কলাশিল্পের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভগ্নাবশেষ ও নমুনা (ও তৎসম্বন্ধে বিদেশীয়দের মতামত) পাওয়া যাইতেছে - সেই অদ্ভুত শিল্প ও স্থাপত্য পরাধীন ভারতবর্ষে অসম্ভব।

হরপ্পা মহেঞ্জোদারোর ধ্বংসাবশেষের আবিষ্কারের পর এই সিদ্ধান্ত নির্নীত হইয়া গিয়াছে যে ভারতের আদিম অধিবাসীরা স্থাপত্য ও চাউশিল্পে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছিলেন। পাঁচ - সাত হাজার বৎসর পূর্ব্বে যে সকল হর্ম্ম্য, পশুপাক্ষী এবং নরমূর্ত্তী নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহাতে একথাটা প্রমাণিত হয় যে আর্যগণ কোন শিলপসংস্কার ভারতে আনেন নাই। তাঁহারা এদেশের আদিম সভ্যতা হইতে তাহা গ্রহণ করিয়াছিলেন। অজন্তা গুহা, খেজুরাহ প্রর্ভতি স্থানে আমা রমণীমূর্ত্তির যে সকল লীলায়িত ভঙ্গী পাই, জীবজন্তুর প্রতিকৃতি দেখিতে পাই, তাহা সেই আদিম শিল্পকলার বিকাশ। আর্যগণ এইজন্য বোধ হয় বাহ্য ঐশ্বর্যের যে সকল বর্ণনা দিয়াছেন তাহা দানব রাক্ষস প্রভৃতির বিদ্যা - এই ভাবের একটা ইঙ্গিত দিয়াছেন। অযোধ্যাপুরীর যে বর্ণনা, তদপেক্ষা লঙ্কার বর্ণনা শতগুণ সমৃদ্ধিসূচক।

পাহাড়পুরের রাধাকৃষ্ণের ছবি গুপ্তরাজত্বের প্রথমভাগের, তাহার মধ্যেও অপূর্ব্ব কমনীয়তা আছে। এই লাবন্যপূর্ণ কমনীয়তা বাঙ্গালাকলমে বাঙ্গালীর নিজস্ব ; যেখানে যেখানে বাঙ্গালী গিয়াছে - সিংহল, আসাম, কাম্বিডিয়া, জাভা, বালী, শ্যাম - সর্ব্বত্রই এই কমনীয়তা তাঁহারা লইয়া গিয়াছে। মেয়েদের ও নায়কের নানারূপ নত্ত্যনশীল ভঙ্গী পাহাড়পুরের মূর্ত্তিতে ফুটিয়াছে - উত্তরকালে এজুরাহ ও ভুবনেশ্বরের অপূর্ব্ব নরনারী - মূর্ত্তির সূচনা ইহাতে দৃষ্ট হয়। মৃন্ময় অদ্ভুত সন্ন্যাসিমূর্ত্তি এবং বানর, সিংহ প্রভৃতি - বেশ দক্ষতার সহিত গঠিত হইয়াছে। চতুসকোণ পোড়া ইটের (terracotta) উপর শ্রেনীবদ্ধ মূর্ত্তি - বাঙ্গলার এই মন্দির - গাত্রের চারুশিল্পের বিশেষত্ব, পরবর্ত্তীকালে উহা খুব শ্রীসম্পন্ন হইয়াছিল। ভিন্ন ভিন্ন যুগের চিত্রপদ্ধতি এই বিস্ময়কর বিহারের গাত্রে দৃষ্ট হয়। নানারূপ পুষ্পের মধ্যে 'পদ্মেরই প্রতিপত্তি অধিক' উহা বুদ্ধদের পদ্মপ্রীতির কথা স্মরণ করাইয়া দেয় -অজন্তারও পদ্মই ফুলগুলির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। এই বিহারের নিম্নস্তরে অনেক হিন্দুদেবদেবীর মূর্ত্তি আছে। সুন্দরবন প্রভৃতি স্থানে বহু প্রাচীন স্তূপ দৃষ্ট হয়, অভিশাপগ্রস্ত বঙ্গের ইতিহাস - লক্ষী সেই সকল স্তূপের অতলতলে বসিয়া

অশ্রুবর্ষণ করিতেছেন। কে তাঁহাকে উদ্ধার করিবে ? পাহাড়পুরে প্রাপ্তমথর্ত্তিগুলির মধ্যে রাধাকৃষ্ণের লীলা ও গোচারণরত রাখালদের দৃশ্য প্রমাণ করিতেছে যে, রাইকানু এদেশে বহু প্রাচীনকালের আরাধ্য। দীক্ষিত মহাশয় মহাস্থানগড় হইতে আর একখানি লিপিযুক্ত প্রস্তর পাইয়াছেন। তাহা মৌর্য্যযুগের ব্রাহ্মীলিপিতে লিখিত।

লক্ষ্ণৌ আর্ট কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত অসিত হালদার অজন্তা - সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "আশ্চর্যের বিষয় অজন্তার ছবির মধ্যে আমরা বাঙ্গলা দেশের প্রচুর আভাস পাই। প্রথমতৎ আমরা গুহার নিকটবর্ত্তী দূরবর্ত্তী গ্রামে বেড়াতে গিয়ে যত কুটীর দেখেছি, সবগুলিই মাটির ছাদ, অজন্তার ছবিতে অবিকল বাংলার খড়ে ছাওয়া আটচালা। সেদেশের লোক নারকেল গাছ যথেষ্ট। বঙ্গদেশে ষাড়ের দেহের তুলায় তাহার স্কন্ধটা যতটা বেশী উঁচু দেখা যায় অন্য কোন দেশে সে রকম দেখা যায় না। অজন্তার ১নং গুহায় ষাঁড়ের লড়াইয়ের ছবিতে ঠিক আমাদের দেশের ষাঁড়ই অঙ্কিত। যশোহর, মেদিনীপুর প্রভৃতি অঞ্চলের শত শত বৎসরের প্রাচীন কাঠের পাটার উপর আঁকা যে সকল চিত্র দেখা যায়, অজন্তার ছবির সঙ্গে তার অঙ্কনপদ্ধতি, এমন কি বর্ণ ও রেখাগুলির (অজন্তার মত অত উৎকৃষ্ট না হ'লেও) একটা অদ্ভুত মিল সহজেই অনুভূত হয়। আমাদের দূর্গা প্রতিমা প্রভৃতির চালচিত্র গুলি এখনও ঠিক অজন্তার নিয়মেই গোবর মাটির জমির সাদা রং দিয় তার উপর আঁকা হয়। কালীঘাটের পটের ও অজন্তার রেখা - কৌশলের মধ্যে খুবই সামঞ্জস্য দেখ্তে পাওয়া যায়। কালীঘাটের এই প্রচলিত পটগুলির রেখার টান দেখ্লেই অজন্তার শিল্পীদের কথা মনে পড়িয়ে দেয়। এই সমস্ত দেখে কবির কথা বলতে ইচ্ছে হয় -

আমাদেরই কোনো সুপটু পতুয়া লীলায়িত তুলিকায়।
আমাদের পট অক্ষয় ক'রে রেখেছে অজন্তায়।।'

অজন্তা গুহায় কতকগুলি চিত্রে মেয়েদের শাড়ী ও পুরুষদের ধুতি ঠিক বাঙ্গালীর মত (গ্রিফিথ্ অজন্তা, ১ম খন্ড, ১৮ -১৯ পৃষ্ঠা)। অজন্তাচিত্রাবলীর একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য ও সৌন্দর্য্য - ফুললতার মধ্যে মনুষ্য ও অপর জীবজন্তুদিগকে মানাইয়া লওয়া। কোন একটা ফুল বা 'পল্লবিনী লতা'র মধ্যে হাতীর ন্যায় একটা বড় জানোয়ার কিংবা চঞ্চুবিশিষ্ট একটা বিরাট্ মরলকে এমনিভাবে শায়িত করিয়া রাখা হইয়াছে যাহতে সেই সপুষ্প লতার বেমালুম মিশিয়া গিয়াছে। উদ্ভিদ্ ও জীবচিত্রের এই মিলনে কোন বঙষম্য ঘটে নাই ; একটা কল্কার ফুলগুলির মধ্যে বামনরূপে কোন পুরুষ, অর্দ্ধশায়িত রমণীরূপে কিংবা ক্ষুদ্রপদ বৃহৎমস্তিক উদ্ভট মনুষ্যরূপে - চিত্রগুলি এমনই ভাবে সাজানো আছে যে সেগুলি যেন শিল্পবাগানের অঙ্গীয় হইয়া গিয়াছে। অধুনা য়ুরোপে এই সকল কলাকার নানারূপ অনুকরণ হইতেছে। বাঙ্গালী চিত্রকরেরাও যে পল্লীগ্রামে এইভাবে জীব - উদ্ভিদের মিলন ঘটাইয়া তাহাদের কল্কার কারুকার্য্য সম্পাদন করিতে পারিতেন, তাহার নিদর্শন আমরা অনেকগুলি পাইয়াছি, যদিও চিত্রহিসাবে সেগুলি অজন্তার

টিপ্পনী

টিপ্পনী

সমকক্ষ নহে। বাঙ্গলাদেশে ষাঁড়ের লড়াইয়ের চ্রি অনেকগুলি পাওয়া গিয়াছে। অজন্তায় তাহা দুর্লভ নহে। তুলনায় বাঙ্গলার চিত্র নিকৃষ্ট নহে। আতীর লড়াই, অজন্তা ও বাঙ্গলা চিত্রে, উভয়েই পাওয়া গিয়াছে।

অজন্তায় বিজয়ের অভিযানে কি অশ্বারোহী কি পদাতিক কি ধ্বজাবাহক কাঋআরও মস্তকে উষ্ণীয় অথবা পাগড়ীর বালাই নাই। উহারা ঠিক বাঙ্গালী। অজন্তাগুহার ছাদের চিত্রগুলি সাধারণভাবে অনেকটা বাঙ্গলাদেশের দূর্গাপ্রতিমার চালচিত্রের মত। মধ্যভারতে ছতরপুরের নিকট রাজগড়ে আমরা ঐরূপ দেখিতে পাই। অজন্তার ১৮নং চিত্রে, পুরুষের ধুতি ও স্ত্রীলোকের শাড়ী ঠিক বাঙ্গালির মত।

অজন্তার সিংহগুলি ঠিক বাঙ্গলার চিত্রিত সিংহের রকম ও কুমরেরা এখনও ঠিক সেই আদর্শ বজায় রাখীয়াছে। উহাতে সিংহের কেশর সুস্পষ্ট নহে। মুখের আকৃতি ছাড়া অপরাপর স্থান কতকটা ঘোড়ার মত। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে বাগবাজারের সার্ব্বজনীন দূর্গোৎসবে প্রতিমার নিম্নে ঐরূপ সিংহ নির্ম্মিত হইয়াছিল। মৎসঙ্কলিত প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়ের দ্বিতীয় ভাগে প্রাচীন মহিষমর্দ্দিনীর যে ছবি দেওয়া হইয়াছে তাহার সিংহও ঠিক এইরূপ। কালীঘাটের অনেক পুরাতন পটে আমরা ঐরূপ সিংহ দেখিয়াছি। সুতরাং অজন্তাগুহার চিত্রকরদের এই পশুরাজের মূর্ত্তিসংস্কার অধুনা পর্য্যন্ত বাঙ্গলায় আসিয়াছে। অশোকস্তম্ভের উপর যে সিংহমুখ দেওয়া হইয়াছে তাহা বাঙ্গলাদেশে চিত্রকর ও কুমারদের মধ্যে বহুকাল প্রচলিত ছিল।

মধ্যযুগে এমন কি মুসলমানদের সময়েও চিত্রবিদ্যা বাঙঙ্গালীর নিজস্ব ছিল। পল্লীবাসিনীরা লক্ষ্মীস্বরূপা ছিলেন। লক্ষণৌর কৌটা খুলিয়া ইহারা ঘরবাড়ী সাজাইতে বসিতেন, ইহারা রন্ধনশালার শিল্পকে বিশিষ্ট স্থান দিয়াছিলেন। কতটা পবিত্রতা ও সম্ভ্রমের সহিত বাঙ্গালীর মেয়েরা এইসকল শিল্পকার্য্য ও রান্না প্রস্তুত করিতেন তাহা কাজলরেখা নামক পল্লীগীতিকা পাঠ করিলে পাঠকেরা বুঝিতে পারিবেন। বরণডালা হইতে আরম্ভ করিয়া নানারূপ আলপনা, দেওয়ালের চিত্র, কাঁথা, বইটে, বালিসের গেলাপ, নূতন আত্মীয়দের বাড়ীতে পাঠাইবার জন্য পানরক্ষার উপযোগী নবীন কদলীপত্রের আধার (নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য নূতন কলাপাতা জলে রাখিয়া শক্ত করা হইত, তন্মধ্যে নানারূপ বিচিত্র চিত্র অঙ্কিত হইত), নানারূপ কারুমণ্ডিত শিকা ও লেপ - তোষক বাঁধিবা দড়ি, বিয়ের কনের কপালে সূক্ষ্ম সন্দনরেখার কারুকার্য্য, বাসরের প্রায় সমস্ত আসবাব, চিত্রিত পিঁড়ে ও কাগজের আসন, পাশা খেলার উযোগী চিত্রিত কাগজ, ছেলেদের পুতুল - এরূপ শত শত প্রকারে মেয়েরা তাঁহাদের কারুকার্য্য দেখাইতেন।

বাঙ্গালী চিত্রকরের অফুরন্ত কল্পনায় একই জিনিষ অসংখ্য আকারে দেখা দিয়াছে ; কি আলপনায়, কি মন্দিরের ইষ্টকে, ক প্রস্তরে, কাষ্ঠফলকে, পুঁথির মলাটে, পিত্তল বা তাম্রপটে, কি

কাঁথায় - চিত্রসম্ভারে অবধি নাই। তূলির লীলায়িত রেখাপাতে কতপ্রকারের নক্সা ও কল্কা যে অঙ্কিত হইয়াছে তাহার সীমা - সংখ্যা নাই ; প্রকতিক অনুসরণ করিলে চিত্রকর অল্পপ সময়েই নিৎস্ব হইয়া পড়িতেন। কারণ প্রকৃতির সৃষ্টি বিশেষ স্থানে নির্দ্দিষ্টসংখ্যক, এবং সেই নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক দ্রব্যের সকলগুলিকে তূলির যোগ্য নহে ; কিন্তু যেখানে মানস হরিদ্বারের উৎস, সেখানে বিষয়বস্তুর অবধি থাকিতে পারে না, নিত্য নবজাত শিশুর ন্যায় কল্পনাসৃষ্ট কুশলতার সংখ্যা গনিত, ভঙ্গিঈ অগণিত এবং রূপ অগণিত। বাঙ্গলার এই ছবিগুলির যে ভান্ডার আছে তাহা অজন্তাকে এই স্থানে হার মানাইয়াছে। অন্যান্য দেশে এক একটি বিশেষ শিল্পী শ্রেণী আছে। কিন্তু এক শতাব্দী পূর্ব্বেও বাঙ্গলার শ্রেণী-নির্ব্বিশেষে সকল জাতির রমণীই কাঁথা সেলাই, আল্পনা দেওয়া, পীড়ি-চিত্র, দেওয়ালে ছবি আঁকা প্রভৃতি বহু শিল্পকার্য্য জানিতেন। এখনও আসামের রেশমের উপর যে সকল সুন্দর-ফুললতার কাজ দেখা যেয় তথাকার রমণীরা তাহা প্রস্তুত করেন। প্রত্যেক ককুমারীকেই বিবাহের পূর্ব্বে তাঁহার হাতের কাজ দেখাইয়া বধূরূপে নির্ব্বাচিত হইতে হয়। বাঙ্গালী রমণীরা শিল্পশাস্ত্রের স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান লইয়াই যযেন ভূমিষ্ঠ হইতেন। তাঁহাদের কাজের যে ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়, তাহাতে এখনকার দিনে যে কোন জাতির মহিলা গৌরবন্বিত হইতে পারেন। বস্তুতঃ এই শিল্পকার্য্য এদেশে এরূপ ব্যাপকরূপে সমাজে প্রচলিত ছিল যে আমাদের বাঙ্গলাদেশকে যে "মগধের ইত্রশালা" বলা হইয়াছে তাহা অত্যুক্তি নহে। বাঙ্গলার খাঁটি শিল্প যাহার সঙ্গে মহেঞ্জোদারো এমন কি সিঙ্গনাপুর-শিল্প হইতে গুপ্ত যুগের শিল্প - অজন্তা, অমরাবতী, বালীদ্বীপ ও সিংহলের শিল্পের সাদৃশ্য স্পষ্ট, তাহাই আমাদের দেশের অব্যাহত প্রাচীন শিল্পধারা - বাঙ্গলার চিত্রশিল্পের সঙ্গে কাঙ্গড়া চিত্রশিল্পের এতটা মিল দেখা যায় যে আমরা দুই শিল্পেকেই অভিন্ন মনে করি। কালীঘাটের পটুয়া ও কাঙ্গড়ার চিত্রকরদিগের একটা জায়গায় অদ্ভুত ঐক্য দেখা যায়। উভয় স্থানের চিত্রকরেরাই তাঁহাদের চিত্রে নানারূপ সরু ও মোটা, সহজ, বক্রান্ত ও কোঁকাড়ান রেখা আঁকিয়া চিত্রগুলিকে একটা বৈশিষ্ট্য দিয়াছেন। অনেক সময়েই ঐ রেখাগুলি বাহ্যতঃ নিরর্থক বলিয়া মনে হইবে কিন্তু ঐ সকল রেখাপাতে চিত্রগৌরব যেন শতগুণে বাড়িয়া গিয়াছে।

আমাদের ধারণা কাঙ্গড়া ও কালীঘাটের কলম এক।

লেখক পরিচিতি : দীনেশচন্দ সেন [১৮৬৬ -১৯৩৯]

পন্ডিত, গবেষক, বাংলার সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাস গ্রন্থ প্রণেতা ঢাকার সূয়াপুর গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন, ১৮২২ তে জগন্নাট বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এনট্রান্স পাশ, ১৮৮৫ তে এফ. এ. পরীক্ষা ঢাকা কলেজ থেকে। ১৮৯১ - কুমিল্লার ভিক্তোরিয়া স্কুলে প্রধান শিক্ষকের কাজে যোগদান। ১৯০৯ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান। বিখ্যাত পূর্ববঙ্গ গীতিকার সম্পাদনা করেন তিনি, 'বৃহৎবঙ্গ' গ্রন্থের লেখক।

টিপ্পনী

টিপ্পনী

- বঙ্গভাষা ও সাহিত্য -১৮৯৬
- রামায়নী কথা -১৯০৪
- বেহুলা - ১৯০৭
- সরল বাংলা সাহিত্য -১৯২২
- প্রাচীন বাংলা সাহিত্য মুসলমানের অবদান - ১৯৪০
- History of Bengali Language and Literature - 1911
- The Folk Literature of Bengali - 1920
- Eastern Bengal Ballads in four volumes 1-1923 -32

প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন।

পাঠপর্যালোচনা :

'বাংলার সংস্কৃতি' প্রবন্ধটি দীনেশচন্দ্রসেন লিখিত 'বৃহৎবদ্দ' নামক প্রবন্ধ গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে। বাংলার সংস্কৃতি নিয়ে তিনি আজীবন অনুসন্ধান করেছেন, সেই সূত্রে বাংলার কোনো গ্রাম - গঞ্জে অনুঘটিত বিষয় গুলিকে তিনি জন সমক্ষে তুলে আনলেনতার সামাজিক - সাহিত্যিক - নান্দনক দিকটি ও বিশ্লেষন কেছেন। দীনেশ চন্দ্র সেনের সেই জুহুরে দৃষ্টির প্রতিফলন আলোচ্য প্রবন্ধে দেখতে পাই।

বাংলার সংস্কৃতি' প্রবন্ধে দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় প্রথমেই শহর - নগরের যে পরিবর্তনশীলতা তা বাংলার পল্লীতে দেখা যায় না বলে মনে করেছেন। তিনি শান্ত পল্লী বাংলার নিবিড় প্রকৃতির সান্নিধ্যের কথা বললেন। গ্রাম বাংলার নিকানো উঠোন, পিঠে সন্দেশ, আলপনা, মন্দিরের কারুকার্য, আমাদের কাছে 'অতিথিদেব্যবঃ' তা সত্যিই অকৃত্রিম এক ধার। পল্লী মানুষের প্রতিটি কাজের মধ্যে যে সূক্ষ্ম শিল্প বোধ ও উন্নত রুচির পরিচয় ছিল তা এখানে ফুটে উঠেছে। আমাদের গ্রামের মহিলাদের হাতে নকসী কাঁথা কেমন তা জানাতে বললেন -

'সেলাই একখানি কাঁথা পারস্যে কার্পেটের মত হইত।'

পুজোর পিঁড়ির আলপনা,পটচিত্র, ছোপানো উঠোন, ঝুলানো শিকা, পানের বাটা, পুঁথির লাঠি দেখে মুগ্ধ হতেই হবে, দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় পল্লী জীবনের সেই সব খুঁটিনাটি চিত্র ও শিল্পকর্ম গভীরভাবে আনুসন্ধান করেছেন।

পল্লীজীবনের কত সাধারণ বিষয় আমাদের সামনে অসাধরণ শিল্প গুন সম্পন্ন হয়ে উঠেছে তার উদাহরণ ছড়িয়ে আছে এই প্রবন্ধে। পল্লীর চিত্রকরদের আঁকাছবি, হালুইকরদের তৈরি মিষ্টি সন্দেশে উপর বাহারি সাজ প্রাবন্ধিকের কলমে -

‘পল্লীর চিত্রকর যে সকল ছবি আঁকিত এবং পল্লীর মিস্ত্রি পোড়া ইটের উপর যে সকল ফুল লতা ও নরনারীর মূর্ত্তী উৎকীর্ন করিত এবং পুঁথির মলাটে যে ছবি আকিত তাহার বিষ্ময়কর সৌন্দর্য্য দেখিয়া এখন ও লোকে মুগ্ধ হইয়া থাকে ; পল্লীর হালকুইকরের হাতে মিছরির খেলনা, নারিকেলের সন্দশের মঠ, গৃহ, জীবজন্তু নানা বর্নে রঞ্জিত হইয়া ছবির মত সাজানো থাকিত, নারিকেলের শাঁস দিয়া এরূপ ময়ূর গঠিত হইত, যাহারা ডানা পাখা ও লেজে ইন্দ্রধনুর বিচিত্রবর্ণ খেলা করিত।’

পল্লীগ্রামের এই শিলপ সুষমা কতটা উৎকীর্ষাত্মক তা বোঝনোর জন্য মৌর্য্য, গুপ্ত-পাল রাজত্বের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। এ হল হিন্দু সভ্যতার এক সচল ধারা। আমাদের কীর্ত্তনগান ও শ্রষ্ঠা, টোলের পন্ডিতদের বিষয় বুৎপত্তি সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ নেই । নটগানের নর্ত্তন বিষয়ঘটিত দৃষ্টিপথের গোচর থেকে সরে যায় নি। এতে পন্ডিত সালোচক গুরুসদয় দত্ত ছিলেন বিভোর । ইউরোপীয় নৃত্যের থেকে আমাদের পল্লী নর্তন যে কত উন্নত বিঞ্জান সম্মত তা গুরুসদয় দত্তের দৃষ্টিতে আলোচনা করে জানালেন -

‘ইনি সমস্ত নৃত্য ভাল করিয়া পরীক্ষা বলিয়াছেন এবং বলিয়া থাকেন যে বঙ্গের পল্লীর রাঁইবেশে বাউল, জারি, দশবতার নৃত্যের যেরূপ বিঞ্জানানুগ অঙ্গভঙ্গী ও সৌষ্ঠব তাআতে ইহাদের এই নৃত্যজগতে প্রথম শ্রেণীতে স্থান পাইবার যোগ্য, এবং ইহা সেই প্রাচীন শিবতান্ডব ও মহাভারতীয় যুগের বহন্নলার নাট্যধার বজায় রাখিয়াছে।’

বাংলা সংস্কৃতি ও বাঙালির শিল্প বোধ ও পটুত্ব কোথায় গিয়ে পৌঁচেছে তা পরবর্তী অংশে আলোচিত হয়েছে । দীনেশচন্দ্র সেন ভারতের স্থাপত্য, শিল্পকলা আলোচনা ক্রমে মহাভারত, চন্দ্রগুপএর কারুকার্য স্থাপত্য, অশোকের স্থাপত ও চিত্রকলা, নালন্দা, মথুরা, ঋহত্তর ভারতের জাভা - যবদ্বীপের বরোবুদুরের মন্দির, অজন্তা - ইলোরার স্থাপত্য ও চিত্রশালার কথা বলেছেন । হরপ্পা-মহঞ্জোদারোর ধ্বযসাবশেষের আবিষ্কার প্রমাণ করে যে ভারতের আদিম আধিবাসীরা শিল্প স্থাপত্য কতটা সচেতন ছিলেন। এই অনার্য সংস্কৃতি সম্পর্কে আর্য আগমনের কোন সম্পর্ক নেই তা বোঝাতে প্রবন্ধকার জানালেন -

‘পাঁচ-সাত হাজার বৎসর পূর্বে যে সকল হর্ম্য্য, পশুপাক্ষী এবং নরমূর্ত্তী নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহাতে একথাটা প্রমানিত হয় যে আর্য্যগন কোন শিল্প সংস্কার ভারতে আনেন নাই।’

আদিম শিল্প কলার যে স্বতস্ফুর্ত ও ভারতব্যাপী ছিল তা দেখা যায় আর্য - অনার্য সংস্কৃতির শিল্প, স্থাপত্য ভাস্কর্য আলোচনাথরএ উঠ এসেছে অযোধ্যা - ললঙ্কার প্রসঙ্গ -

‘অযোধ্যাপুরীর যে বর্ণনা, তদপেক্ষা লঙ্কার বর্ণনা শতগুন সমৃদ্ধিসূচক।’

টিপ্পনী

বৃহত ভারতবর্ষের বিভিন্ন শিল্পকর্মে বাঙালির ছোঁয়া আছে তা দীনেশ আবু দেখিয়েছেন। বাংলার মন্দির গাত্রের চারিশিল্প পোড়ামাইর কাজ পরবর্তী কালে আরো শিল্প সৌন্দর্য লাভ করেছে। পাহাড়পুরের রাধা-কৃষ্ণে ছবি কমণিয়তা ও অন্যান্য স্থানে বাঙালীর হাতের কমল স্পর্শের কথা বলতে গিয়ে তিনি লিখলেন -

'এই লাবন্যপূর্ণ কমনীয়তা বাঙলাকলমে নিজস্ব, যেখানে সেখানে বাঙ্গালী গিয়াছে - সিংহল, আসাম, কম্বোডিয়া,. জাভা, বালী, শ্যাম - সর্ব্বত্রই এই কমনীয়তা তাঁহারা লইয়া গিয়াছে।'

বাঙালী শুধু বাংলার মধ্যে আঁটকে ছিলনা তাদের একটা বৃহত জগত ছিল তা উপরিউক্ত আলোচনায় উঠে এসেছে। তার তার শিল্পকলার ছাপ সেখানেই রেখে এসেছে। 'রাইকানু' যে আমাদের দেশে বহু কাল হতে আরাধ্যা।পাহাড়পুরের মূর্ত্তি দেখে একথা বলেছেন। আমাদের দেশের বহু স্তুপ নদী অরণ্যের গর্ভে ভগ্ন তা জানাতে গিয়ে প্রবন্ধকার লিখলেন -

'সুন্দরবন প্রভৃতি স্থানে ব্ প্রাচীন স্তূপ দৃষ্ট হয়, অভিশাপগ্রস্ত বঙ্গের ইতিহাস লক্ষ্মী সেই সকল স্তূপের অতলতলে বসিয়া অশ্রুবর্ষণ করিতেছেন। কে তাঁহাকে উদ্ধার করিবে?'

বাঙালীর পতুব কোথায় গিয়ে পৌঁচেছে তা জানাতে দীনেশবাবু লক্ষ্ণৌ আর্ট কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত অসিত হালদার উক্তি গ্রহণ করেছেন। অজন্তার গুহাচিত্রে তিনি বাংলা দেশের প্রচুর মিলখুঁজে পেয়েছেন। সেখানে কুটীর থেকে নারকেল গাছ, ষাঁড়ের বর্ণনায় বাংলাদেশের প্রকৃতিকে খুঁজে পেয়েছেন। যশোর, মেদিনীপুর অঞ্চলের কাঠের পাটার উপর চিত্রের সঙ্গেও অজন্তার রেখা কৌশলের ও সামঞ্জস্য পাওয়া যায়। অজন্তার চিত্রগুলি বাঙলী মনোভাবে বাঙালীর হাতের ছোঁয়া আছে বক্ষ্যমান প্রবন্ধে সে সম্বন্ধে বলা হয়েছে -

> 'অজন্তায় বিজয়ের অভিযানে কি অশ্বারোহী কি পদাতিক কি ধ্বজাবাহক কাহারও মস্তকে উষ্ণীয় অথবা পাগড়ীর বালাই নাই। উহারা ঙিক বাঙালী। অজন্তাগুআর ছাদের চিত্রগুলি সাধারণভাবে অনেকটা বাঙ্গলাদেশের দুর্গা - প্রতিমার চালচিত্রর মত। মধ্যভারতে ছতরপুরের নিকট রাজগড়ে আমরা ঐরূপ দেখিতে পাই। অজন্তার ১৮ নং চিত্রে পুরুষের ধূতি ও স্ত্রীলোকের শাড়ী ঠিক বাঙ্গালীর মত।'

চিত্র বিদ্যা ছিল বাঙালী নিজস্ব বিষয়। নদি, খাল, বিল, দীঘি, আম -কাঁঠাল-জাম সমৃদ্ধ পল্লী বাসিনী মহিলাদের হেঁসেলের কারুকার্য ও রঞ্জন প্রণালী শিল্পের রূপ নিয়েছে। তা বর্ণনা করতে গিয়ে পূর্ববঙ্গগীতিকার 'কাজলরেখা' গীতিকার উদাহরণ দিয়েছেন। বাঙাললী মহিলাদের সৃষ্টি ক্ষমতা যে কতদূর তা গীতিকাটি আলোচনা করে লিখলেন -

‘বরণডালা হইতে আরম্ভ করিয়া আলপনা, দেওয়ালের চিত্র, কাঁথা, বইটে, বালিসের গোলাপ ..... নানারূপ কারুমন্ডিত শিকা ও লেপ - তোষক বাঁধিবার দড়ি, বিয়ের কনের কপালে সূক্ষ্ম চন্দনরেখার কারুকার্য, বাসরের পরায় সমস্ত আসবাব, চিত্রিত পঁড়ে ও কাগজের আচন, পাশা খেলার উপযোগী চিত্রিত কাগজ, ছেলেদের পুতুল - এরূপ শত শত প্রকারে মেয়েরা তাঁহাদের কারুকার্য্য দেখাইতেন।’

সৃষ্টিশীল বাঙালীর মনের প্রকাশ শুধু স্থাপত্য, ভাস্কর্য্যে নয় রন্ধনশালা ও দৈনন্দিন জীবজনে ও তার বহঃপ্রকাশ। ছবির বৈচিত্র অজন্তা এখানে হার মেনেছে। বাঙালী রমনীদের এই শিল্পজ্ঞান সম্বন্ধে প্রাবন্ধিক স্পষ্ট করে জানালেন -

‘বাঙ্গালী রমণিরা শল্পশাস্ত্রে স্বতঃতসিদ্ধ জ্ঞান লইয়াই যেন ভূমিষ্ঠ হইতেন।’
এ আমাদের গৌরবজ্বল দিক। এজন্য আমাদের বাংলাদেশ কে ‘মগধের চিত্রশালা’ বলাহয়েছে। অন্তিমে দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় কাঙ্গড়া ও কালীঘাটের চিত্র গুলি সর, মোটা, বক্র রেখা দেখে মন্তব্য করলেন - ‘আমাদের ধারনা কাঙ্গড়া ও কালঘাটের কলম এক।’

সাহিত্য রসিক, পআচীন শিল্পকলা ও গীতিকার বিশেষঞ্জ দীনেশচন্দ্র সেন ‘বাংলার সংস্কৃতি’ প্রবন্ধে বাংলা ও বাঙালীর সৃষ্টিশীলতা কোথায় গিয়ে পৌঁচেছে তা তুলে ধরেছেন। পল্লীগীতি সংগ্রহে তার আগ্রহের অন্ত নেই। পূর্ববঙ্গ গীতিকা ও মৈমনসিংহ গীতিকাকে তিনি বিশ্বসাহিত্যের অঙ্গনে টেনে আনলেন। তার সর্বজনীন রসাবেদন বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরে সাহিত্য-শিল্প প্রীতির যেমন পরিচয় দিএছেন তেমনি বাঙালী সংস্কৃতি ও লোকসংস্কৃতিকে আঞ্চলিকতার গন্ডী মুক্তকরে জনসম্মুখে তুলে ধরলেন। তার এই প্রবন্ধে সমাজ-সংস্কৃতি, শিল্প, ইতিহাস, নৃতত্ত্ব, পুরাণ ও শিল্প কলার পরিচয় বহন করছে।

আদর্শ প্রশ্নমালা :

ক. ‘বাংলার সংস্কৃতি’ প্রবন্ধে দীনেশচন্দ্র সেনের দৃষ্টিতে পল্লী বাংলার ঘরোয়া বিষয় গুলি কিভাবে শিল্পরূপ নিয়েছে তা বর্ণনা কর।

খ. ‘অযোধ্যাপূরীর যে বর্ণনা, তদপেক্ষা লঙ্কার বর্ণনা শতগুণ সমৃদ্ধিসূচক ।’ - আদিম অধিবাসীদের স্থাপত্য যে কতটা সৃষ্টিশীলতা উপরিউক্ত মন্তব্যের আলোকে বিচার কর।

গ. অজন্তার গুহাচিত্রে বাঙালীয়ানার প্রভাব সম্পর্কে প্রবন্ধকারের বক্তব্য প্রতিপাদন কর।

ঘ. বাংলাদেশকে বলা যায় ‘মগধের চিত্রশালা’ - এ যুক্তির পক্ষে অভিমত জ্ঞাপন কর।

ঙ. ‘বাঙ্গালী রমনীরা শিল্পশাস্ত্রের স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান লইয়াই যেন ভূমিষ্ঠ হইতেন ।’ - এ উক্তি যথার্থতা নিরুপন কর।

টিপ্পনী

টিপ্পনী

মানবসভ্যতা ও বিজ্ঞান

প্রিয়দারঞ্জন রায়

টিপ্পনী

মানবসভ্যতা গড়ে উঠেছে জ্ঞানের আলেকে, তার ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ অনুভূতি থেকে, যাকে বলা যেতে পারে তার প্রকৃতিদত্ত বা জন্মগত অধিকার। কিন্তু ইন্দ্রয়ানুভূতির জ্ঞান খুবই সীমাবদ্ধ। কারণ এই জ্ঞান তার নিজের কোন চেষ্টার অপেক্ষা রাখে না। এটা তার আপন উপার্জিত জ্ঞান নয়। কিন্তু মানুষ তার আপন মন ও বুদ্ধির প্রভাবে যখন এই জ্ঞানের পরিধিকে বাড়িয়ে তুলবার চেষ্টা করে তখন তাকে বলা হয় বিজ্ঞান। প্রকৃতপক্ষ মানুষ জ্ঞানের কোন সীমানা এ পর্যন্ত নির্দেশ করতে পারে নি। এ কারণে বিজ্ঞানের সংজ্ঞা হচ্ছে এক সতত অপসয়মান লক্ষ্যের অভিমুখে বিরামহীন অনুসরণ। এ লক্ষ্য হচ্ছে পরম জ্ঞান বা পরম সত্য, যা জানলে আর কিছুই জানবার থাকে না। জ্ঞান একটি শক্তিবিশেষ। এই জ্ঞানের বা বিজ্ঞানের সাধনাতেই মানুষ হয় শক্তিমান। আপন বুদ্ধির কৌশলে মানুষ এই শক্তিকে বিপুল পরিমানে বাড়িয়ে তুলতে পারে। বিগত দেড়শত বৎসরের মধ্যে, বিশেষত প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যে , বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদার যে অভূতপূর্ব অগ্রগতি ও বিস্ময়কর আবিষ্কার ঘটেছে, তার ফলে মানুষের হাতে এসেছে অসাধারণ শক্তি যার প্রয়োগে সে সক্ষম হয়েছে মানবসমাজের বহু কল্যাণ সাধনে এবং বহু দুরূহ সমস্যার সমাধানে। অসাধারণ বেগাণ যানবাহনের সৃষ্টি করে মানুষ আজ দেশ ও কালের ব্যবধানকে করেছে খর্ব, বিভিন্ন দেশ ও জাতির মধ্যে পরস্পরের যাতাযাত ও তাদের পণ্যদ্রবাদির বিনিময় করেছে সুগম।

দুটি প্রবল সজাত প্রবৃত্তি বা সংস্কার নিয়ে মানবশিশু জন্মগ্রহণ করে। এই দুটি প্রবৃত্তি হলঃ (১) বাঁচবার প্রবৃত্তি বা তাড়না, এবং (২) দৃশমান বহির্জগৎকে জানবার আকাঙ্খা। অবশ্য এই দুটি পরস্পরকে পরিপূরক। বিজ্ঞান এই বহির্জগতের বিচিত্র জ্ঞেয় বস্তুর উপাদান সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ করে। দর্শন জানতে চায় জ্ঞাতাকে। সংক্ষেপে বলা যায় দর্শন অনুসন্ধান করে বহুর মধ্যে এক-কে, আর বিজ্ঞানও জানতে চায় সেই বহুর উৎস এক-কে অথবা খন্ডের মধ্যে অখন্ডকে। কিন্তু বিজ্ঞানের জ্ঞানের প্রয়োগে (প্রযুক্তিবিদ্যা) মানুষ ব্যবহাইক জীবনে বহু সুযোগ-সুবিধা সৃষ্ট করে তার জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে সক্ষম হয়েছে, একথা কারো অবিদিত নয়। মানুষের জ্ঞানের প্রসার বেড়ে গেছে বিস্ময়করভাবে।

এর দৃষ্টান্ত আমরা পাই আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানে কোয়াসার (Quasar), পালসার (Pulsar), নিউট্রণ নক্ষত্র, ব্ল্যাকহোল (black hole) ইত্যাদি নক্ষত্রের বা তাদের দেহপিন্ডের ভগ্নাবশেষের আবিষ্কারে। বিজ্ঞানের গণনায় এইসব নক্ষত্রের এক ঘন ইঞ্চি পরিমাণ দেহপিন্ডের ওজন দশ হাজার লক্ষ টন। ব্রহ্মান্ডের সীমান্তনিবাসী (পৃথিবী থেকে ১২ শত লক্ষ আলোকবর্ষের

টিপ্পনী

দূরবর্তী) কোয়াসার নক্ষত্রের দেহপিন্ডের দীপ্তি বিজ্ঞানীদের হিসেবে এক লক্ষাধিক কোটি সূর্যের দীপ্তীর সমান। এসব তথ্য মানুষের ধারণার অতীত।

পদার্থবিজ্ঞানীরা প্রখর সংবেদনশীল যন্ত্রযোগে এখন গামা রশ্মি, একস্‌রশ্মি, রেডিওতরঙ্গ রশ্মির অস্তিত্বের সন্ধান করতে, এমন কি দৃশ্যমান বর্ণালীর মধ্যপ্রদেশ থেকে বিদ্যুৎচৌম্বক শক্তির বিকিরন প্রক্রিয়াও পরীক্ষা বা পর্যবেক্ষণ করতে সমর্থ হয়েছেন।

রসায়ন বিজ্ঞানেও বিজ্ঞানীদের আধুনিক সফল গবেষণার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো - ত্রিমাত্রিক আণবিক গঠনের উপলব্ধি, রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় গতিবেগের নির্ধারণ, আণবিক কোয়ানটাম তত্ত্ব ইত্যাদি।

ভূবিজ্ঞানীদের গবেষণার ফলে আমাদের পৃথিবী গ্রহের গঠন সম্পর্কে অনেক তথ্য জানা গেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, বিবিধ শিলা ও ভূপৃষ্ঠের শিলাস্তরের গঠন সম্বন্ধে জ্ঞান (plate tectonics)।

জীববিজ্ঞানের অগ্রগতি ঘটেছে অভূতপূর্বভাবে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে - জননকোষের অভ্যন্তরে যুগ্ম উপাদান জিনে (gene) রাসায়নিক ভিত্তির উপলব্ধি, জিন থেকে প্রোটিন (আমিষ জাতীয়) পদার্থের সৃষ্টি, যে অবস্থাবিশেষে জিনের ক্রিয়ার পরিবর্তন ঘটে, প্রোটিন অণুর ত্রৈমাত্রিক গঠন যা জীবকোষের অভ্যন্তরের সকল প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে, প্রত্যেক জীবকোষ যে যুগপৎ হাজার রাসয়নিক প্রক্রিয়ার আধার ও নিয়ামক, এই সকল প্রক্রিয়ার প্রত্যেকটির গতিবেগ যে সমতালে বাধা ও প্রত্যেক বিশিষ্ট জীবের জীবনের প্রয়োজনের অনুবর্তী ইত্যাদি যাবতীয় বিষয় সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান।

জীবকোষের সুসঙ্গত ও সুষম সমাবেশ এখন আমাদের কাছে সহজবোধ্য। এ থেকে বলা যায় যে, গেনোম (genome) পরিচিহ্নিত প্রোটিন সংশ্লেষণের যাবতীয় বিবরণ থেকে আমরা জীবকোষের গঠন ও প্রক্রিয়া সম্বন্ধে সকল প্রকার জ্ঞানলাভ করতে পারি। গেনামে বলতে বিঝায় জীবকোষের কেন্দ্রে অবস্থিত ক্রোমোসোম (chromosome) নামক দীর্ঘসূত্রাকার অতিকায় রাসায়নিক অনূর সংযোগবিশেষ। বহু গেনামে মিলে গড়ে ওঠে অর্গানেলস্ (organells - জীবকোষের কেন্দ্রের বহিঃস্থ অংশবিশেষ)। এইসব অর্গানেলস্ জুড়ে সৃষ্টি হয় জীবকোষের একজাতীয় বহুকোষ, এইগুলি মিলে জীবের এক একটি অঙ্গের সৃষ্টি করে এবং অঙ্গসমূহ পরস্পর জুড়ে সৃষ্টি করে একটি পূর্ণাবয়ব জীব, এক জাতীয় বহুজীব আপনা থেকে জড় হয়ে গড়ে একটি সংঘ (colony), সংঘ পরিবার (pack), এমন কি দল (flock) ইত্যাদি।

জীবকোষের অভ্যন্তরে জীবনের প্রক্রিয়া সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানের আভূতপূর্ব প্রসার

ঘটেছে , সেই সঙ্গে শরিরতত্ত্ব সম্পর্কে আমাদের গবেষণাও দ্রুততালে এগিয়ে চলেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় - যকৃৎ শরীরের মধ্যে একটি কারখানার কাজ করে, যকৃতের মধ্যে বিবিধ রাসায়নিক পদার্থের উৎপাদন, স্নায়বিক আবেগের পরিবহণ পরিচালনার ব্যাপার, রক্তের সংযুতি (composition) সংরক্ষণে কিডনির কৃতিত্ব, মাংসপেশীর সংকোচন, উদ্ভিদদেহে আলোকের মাধ্যমে রাসানিক সংশ্লেষন (photosynthesis) ইত্যাদি।

চিকিৎসাবিজ্ঞান নতুন নতুন দিগন্তের সূচনা করেছে : দেহের পুষ্টি সম্পর্কিত জ্ঞান, রন্ধ্রবিহীন গ্রন্থির (Indocrine) বিকার, রোগজীবানুর (bacteria) সংক্রমণ এবং রোগোৎপাদক কয়েকজাতীয় বিষের (virus) সংক্রমন, যাদের প্রতিষেধক পদ্ধতি হচ্ছে টীকা দেওয়ার ব্যবস্থায় (vaccination) । বর্তমানে বিজ্ঞানীদের প্রচেষ্টা কেন্দ্রীভূত হয়েছে সুপ্রজনন (Genetic) রোগের ক্ষেত্রে, যার প্রায় দু হাজার রকম রোগের মধ্যে মাত্র দশ শতাংশ সম্বন্ধে আমরা অবহিত আছি। তবে দুঃখের বিষয় এই যে, বহু দুরারোগ্য ব্যাধি সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা এখনও ফলপ্রসু কিছু আবিষ্কার করতে পারেন নি। মানবজিবনের ভাগ্যলিপির রাসায়নিক ভিত্তি সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান যে কতদূর অগ্রসর হয়েছে - এটি তারই বিবরণ। কিন্তু আমরা এখনও মস্তিষ্কের কোষরাজির অপূর্ব সমাবেশ ও তাদের প্রক্রিয়া সম্বন্ধে জ্ঞানের উপলব্ধিতে অগ্রসর হতে পারি নি।

বর্তমান যুগে Computer যন্ত্রের উদ্ভাবন ও ববহার গণিতশাস্ত্রে এক নতুন দিগন্তের সূচনা করেছে। কোন জটিল অঙ্কের ফলাফল কষে বের করতে আগে যেখানে কোন সুদক্ষ বিজ্ঞানীরা সাত - আট দিন সময় লাগত, বর্তমানে কমপিউটার যন্ত্রের সাহায্যে তা কয়েক মিনিটের মধ্যে জানা যায়।

বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিকের সাম্প্রতিক অগ্রগতির অতি সংক্ষিপ্ত ধারাবাহিক বিবরণী উপরে দেওয়া হলো।

যদিও আমরা জানি, Scince for its own sake, অর্থাৎ কেবল জ্ঞান অর্জনের জন্যই বিজ্ঞানের চর্চা, তবুও এই অর্জিত জ্ঞানকে মানবকল্যাণে ও সমাজ উন্নয়নের বিভিন্ন স্তরে প্রয়োগ করে আধুনিক জীবনযাপনের মান উন্নীত করা হয়েছে। এই বিশ্বাস আজ প্রতি মানুষের মনে দৃঢ়বদ্ধ যে, কালক্রমে একদিন বিজ্ঞান মানবজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সর্বাঙ্গীণ উন্নয়ন সাধন করবে : জন সাধারণের স্বাস্থের উন্নতি, উন্নত উপায়ে কৃষিকার্মে খাদোৎপাদন, বাসগৃহ নির্মার্ণের উন্নয়ন, উন্নত পরিবহণ, শিক্ষাবিধির উন্নতি সাধন, মানুষযের শ্রমের লঘুকরণ ইত্যাদি। আধুনিক প্রয়োগবিজ্ঞান বা প্রযুক্তিবিদ্যা শুধু যে ব্যবহারিক জগতে আমাদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন করেছে তা নয়, মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির পরম উৎকর্ষ সাধন করেছে।

টিপ্পনী

ঘটেছে , সেই সঙ্গে শরিরতত্ত্ব সম্পর্কে আমাদের গবেষণাও দ্রুততালে এগিয়ে চলেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় - যকৃৎ শরীরের মধ্যে ্কটি কাখানার কাজ করে, যকৃতের মধ্যে বিবিধ রাসায়নিক পদার্ধের উৎপাদন, স্নায়বিক আবেগের পরিবহণ পরিচালনার ব্যাপার, রক্তের সংযুতি (composition) সংরক্ষণে কিডনির কৃতিত্ব, মাংসপেশীর সংকোচন, উদ্ভিদদেহে আলোকের মাধ্যমে রাসানিক সংশ্লেষন (photosynthesis) ইত্যাদি।

চিকিৎসাবিজ্ঞান নতুন নতুন দিগন্তের সূচনা করেছে : দেহের পুষ্টি সম্পর্কিত জ্ঞান, রন্ধ্রবিহীন গ্রন্থির (Indocrine) বিকার, রোগজীবানুর (bacteria) সংক্রমণ এবং রোগোৎপাদক কয়েকজাতীয় বিষের (virus) সংক্রমন, যাদের প্রতিষেধক পদ্ধতি হচ্ছে টীকা দেওয়ার ব্যবস্থায় (vaccination) । বর্তমানে বিজ্ঞানীদের প্রচেষ্টা কেন্দ্রীভূত হয়েছে সুপ্রজনন (Genetic) রোগের ক্ষেত্রে, যার প্রায় দু হাজার রকম রোগের মধ্যে মাত্র দশ শতাংশ সম্বন্ধে আমরা অবহিত আছি। তবে দুঃখের বিষয় এই যে, বহু দুরারোগ্য ব্যাধি সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা এখনও ফলপ্রসু কিছু আবিষ্কার করতে পারেন নি। মানবজিবনের ভাগ্যলিপির রাসায়নিক ভিত্তি সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান যে কতদূর অগ্রসর হয়েছে - এটি তারই বিবরণ। কিন্তু আমরা এখনও মস্তিষ্কের কোষরাজির অপূর্ব সমাবেশ ও তাদের প্রক্রিয়া সম্বন্ধে জ্ঞানের উপলব্ধিতে অগ্রসর হতে পারি নি।

বর্তমান যুগে Computer যন্ত্রের উদ্ভাবন ও ববহার গণিতশাস্ত্রে এক নতুন দিগন্তের সূচনা করেছে। কোন জটিল অঙ্কের ফলাফল কষে বের করতে আগে যেখানে কোন সুদক্ষ বিজ্ঞানীরা সাত - আট দিন সময় লাগত, বর্তমানে কমপিউটার যন্ত্রের সাহায্যে তা কয়েক মিনিটের মধ্যে জানা যায়।

বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিকের সাম্প্রতিক অগ্রগতির অতি সংক্ষিপ্ত ধারাবাহিক বিবরণী উপরে দেওয়া হলো।

যদিও আমরা জানি, Scince for its own sake, অর্থাৎ কেবল জ্ঞান অর্ঝনের জন্যই বিজ্ঞানের চর্চা, তবুও এই অর্জিত জ্ঞানকে মানবকল্যাণে ও সমাজ উন্নয়নের বিভিন্ন স্তরে প্রয়োগ করে আধুনিক জীবনযাপনের মান উন্নীত করা হয়েছে। এই বিশ্বাস আজ প্রতি মানুষের মনে দৃঢ়বদ্ধ যে, কালক্রমে একদিন বিজ্ঞান মানবজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সর্বাঙ্গীণ উন্নয়ন সাধন করবে : জন সাধারণের স্বাস্থের উন্নতি, উন্নত উপায়ে কৃষিকার্মে খাদোৎপাদন, বাসগৃহ নির্মার্ণের উন্নয়ন, উন্নত পরিবহণ, শিক্ষাবিধির উন্নতি সাধন, মানুষযের শ্রমের লঘুকরণ ইত্যাদি। আধুনিক প্রয়োগবিজ্ঞান বা প্রযুক্তিবিদ্যা শুধু যে ব্যবহারিক জগতে আমাদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন করেছে তা নয়, মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির পরম উৎকর্ষ সাধন করেছে।

কাজেই আমরা দেখতে পাচ্ছি, বিজ্ঞানচর্চার ফলে মানুষের হাতে এসেছে আজ অভাবনীয় ক্ষমতা (দেবতার ক্ষমতা) ও কুবেরের ধনভান্ডার। কিন্তু অপরিসীম পরিতাপের বিষয় এই যে, মানুষ অনেক ক্ষেত্রে আজ সে ক্ষমতা ও সম্পদকে ববহার করেছে দানবের মনোবৃত্তি দিয়ে। তার দৃষ্টান্ত আমরা দেখেছি, দুটি বিশ্বযুদ্ধে পারমাণবিক ও হাইড্রোজেন বোমা এবং অন্যান্য দূরগামী মারণাস্ত্রের ব্যবহারে। আজ বিশ্বের শক্তিশালী রাষ্ট্রগুল;ইর মধ্যে এই ক্ষমতার প্রতিদ্বন্দিতায় সৃষ্টি হয়েছে তথাকথিত ঠান্ডা লড়াই বা Cold war যার বিষময় পরিণতিতে যদি আরো কোন বিশ্বযুদ্ধ বাধে, তবে আমাদের এই সুন্দর পৃথিবী পরমাণু বোমার প্রয়োগে মুহূর্তে মধ্যে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হবে। প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখযোগ্য যে, কিছুকাল আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিনেট সভায় এক বিবরণী পেশ করা হয়েছিল। তা থেকে দেখা যায় যে, ১৯৭৪ সালের শেষ অবধি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চার লক্ষ পারমাণবিক বোমা তৈরি করে মজুদ করেছেন এবং একই সময়ে সোভিয়েট রাষ্ট্র নির্মান ও মজুদ করেছেন এক লক্ষ অনুরূপ বোমা। বর্তমানে প্রত্যহ মার্কিন রাষ্ট্র নির্মান করছে চারটি কর বোমা ও সোভিয়েট রাষ্ট্র করছে একটি। বলা প্রয়োজন যে, ওভিয়েট রাষ্ট্রের একটি পারমানবিক বোমা তার ধ্বংসের শক্তিতে মার্কিন রাষ্ট্রের চারটি বোমার সমান। আশ্চর্বর বিষয় এই যে, দুটি রাষ্ট্রই মনে করে যে এরূপেই তাদের শক্তির ভারসাম্য সংরক্ষিত হবে ও পৃথিবীতে স্থায়ী শান্তি বজায় থাকবে। কিন্তু রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে পরস্পরের মধ্যে ব্যবহারে সহৃদয়তার এতই অভাব এং কূটনীতির বাকপটুতার এতই প্রভাব যে তাদের মধ্যে এই জাতীয় চুক্তি ফলপরসূ হয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। তাই আজও মধ্য-এশীয়া (ভিয়েতনাম) ও পশ্চিম এশিয়া (জেরুজালেম, প্যালেস্টাইন, সিরিয়া ইত্যাদি) রাষ্ট্রগুলিতে যুদ্ধের আগুন নেভবার কোন লক্ষণ দেখা যায় না। সম্প্রতি চীনও এই প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়েছে। পৃথিবীর প্রতিটি স্বাধীন রাষ্ট্রই আজ আপন আপন নিরাপত্তার অজুহাতে পারমাণবিক বোমা ও অন্যান্য মারণাস্ত্রের নির্মাণে প্রয়াসী হয়ে উঠেছেন।

সুতরাং বলা যায় পৃথিবীর বর্তমান সভ্যতা অপ্তিহত গতিতে এগিয়ে চলেছে এক বিপুল সংকট-সংকুল অবস্থার অভিমুখে। আমাদে প্রাচীন সভ্যতা যাচ্ছে ভেঙে চূর্নবিচূর্ণ হয়ে এবং তার শাশ্বত মূল্যবোধ ওলটপালট ও ধূলিসাৎ হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে আরও উল্লেখযোগ্য যে, সামরিক আয়োজন মেটাতেও ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাহিদা পূরণের তাগিদে মানুষ আজ পৃথিবীর খনিজ সম্পদকে নির্বিচারে শোষন করছে। পৃথিবীর এই বর্তমান পরিস্থিত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, অসংযত ক্ষমতা ও আধিপত্যের লোভ সৃষ্টি করে মানুষ মানুষে বা রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে দ্বন্দ্ব-বিরোধের এবং ব্যাপকভাবে তাদের বহু দুঃখ দুর্দশার সৃষ্টি করছে। সুতরাং বলা যায় যে, মানুষের কল্যানের জন্যা পার্থিব সমৃদ্ধিকে প্রতিষ্ঠিত ও নিয়ন্ত্রিত করতে হবে আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও নীতিবোধের প্রভাবে।কারন মানুষ এবং তার সভ্যতাকে এই আসন্ন সংকট-সংকুল পরিস্থিতি থেকে কোন যান্ত্রিক উপায়ে বা বুদ্ধিকৌশলের প্রভাবে রক্ষা করার সম্ভাবনা নেই। এই প্রসঙ্গে

টিপ্পনী

টিপ্পনী

বর্তমান শতাব্দীর বিস্ববিশ্রুত বিজ্ঞানী Albert Einstein- এর উক্তি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য মনে করি। তিনি বলেছেন : 'Science is lame without Religion, and eligion is blind without Science'। এর বাংলা হচ্ছে, ধর্মবিহীন বিজ্ঞান হচ্ছে খোঁড়া এবং বিজ্ঞানহীন ধর্ম হচ্ছে অন্ধ।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিরবিদ্যার বিস্ময়কর অগ্রগতি এবং মানব-সভ্যতা ও সমাজের উপর তাদের ফলাফল সম্বন্ধে যে বিবৃত উপ[রে দেওয়া হলো তা থেকে পরিস্ফুট হয় যে, বিজ্ঞানের জ্ঞানের অনুশীলনের ফলে মানুষ তার মন ও বুদ্ধির অপরিসীম উৎকর্ষ সাধনে সমর্থ, এবং পৃথিবীতে দূর্বলতম জীব হয়েও অভূতপূর্ব কৃতিত্ব ও প্রতিপত্তি অর্জননে সক্ষম হয়েছে। তবুও একথা মানতে হবে যে, বিজ্ঞানীর পক্ষে তা বিশেষ সহায়ক হয়ে ওঠে নি। কারণ, আজকের পৃথিবী ও মানবসভ্যতা একটি চরম নির্বাচন ও সমস্যার মুখোমুখি হয়েছে ; আরাম ও প্রাচুর্যভরা ভবিষ্যৎজীবন, যাতে মানুষ স্বাধীনভাবে শান্ত ও সুন্দর পরিবেশে তার অভিব্যাক্তির তুঙ্গতম সোপানে আরোহণের চেষ্টা করবে ; অথবা, মনুষ্যত্বেরর ঘোরতব অবনমনে এক পারমাণবিক প্রলয়ঙ্কর বিশ্বব্যাপী যুদ্ধবিগ্রহের অভিমুখে অগ্রসর হয়ে মানবসমাজ ও সভ্যতার বিলোপ ঘটাবে। এই দুইটি সম্ভাবনার মধ্যে ভবিষ্যতে মানুষের ভাগ্যে কোন্‌টি সত্য হয়ে উঠবে তা নির্ভর করবে বিজ্ঞানীদের ধর্মবুদ্ধি ও মনোবৃত্তির উপর।

এই প্রসঙ্গে সপ্তদশ শতাব্দীর প্রখ্যাত ফরাসি বিজ্ঞানী ও দার্শনিক মনীষী প্যাসকেল, তাঁর 'পেনসিজ' গ্রন্থে লিখে গেছেন, পৃথিবীর বর্তমান পরিস্থিতিতে তা আমদের বিশেষ প্রণিধানযোগ্য মনে করি। -

'মানুষ ত নলখাগড়ার চেয়ে বড় বেশি কিছু নয় ; প্রাকৃতিক জগতে দূর্বলতম প্রাণী মানুষ, কিন্তু তবু সে চিন্তাশীল। তাকে পিষে মারবার জন্য সমগ্র বিশ্বের অস্ত্রসজ্জার দরকার নেই। একটু আষ্প, একবিনন্দু জলই তাকে মেরে ফেলার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু বিশ্বজগৎ যদি তাকে মেরেই ফেলে তা হলে মানুষ তার হতাকারীর চেএ বেশি মহীয়ান হবে। কেন না সে জানে সে মৃত্যুযবরণ করেছে তার বিশ্বজগৎ তার বিন্দুবিসর্গ কিছু জানে না।

আমদের তাবৎ মর্যাদার উৎস চিন্তাশীলতা। এর সাহায্যে আমাদের উন্নীত হতেই হবে, মহাশূন্য ও অপূরণীয় দিয়ে নয়। মহাকাশে, আমি আমার মর্যাদার (Personal potential) সন্ধান নিশ্চয়ই করব না, কিন্তু আমার চিন্তাধারা নিয়ন্ত্রণ করে যদি নিজস্ব জগতের অধিকারী হই, তা হলে চাইবার মত আর বেশী কিছু আমার থাকবে না।'

মানবকল্যানে বিজ্ঞানের বিবিধ অবদানের পরিচয় উপরে দিয়েছি এবং এও বলেছি যে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার অপব্যবহারের ফলে আজ বিশ্ব জুড়ে মানুষ ও তার সভ্যতার এক চরম

সংকট দেখাদিয়েছে । বিশ্বভুবনের তুলনায় মানুষ ক্ষুদ্রতম অণু থেকেও অণুর ছোট (অণোরণীয়ান্) হয়েও সে তার চিন্তা ও মননশীলতার প্রভাবে মহৎ থেকেও মহানের (মহতো মহীয়ান্) কল্পনা করে তার উপলব্ধির প্রয়াসী হওয়াই সবচেয়ে বড় আশ্চর্য। এই হলো বিজ্ঞানের সাধনা ও অপরপক্ষে ধর্মেরও সাধনা। এরই প্রেরণায় মানুষ চায় তার অন্তর্জগতের মধ্যেই অসীম বিশ্বজগতের উপলব্ধি করতে বা অনন্তের সঙ্গীত শুনতে - সীমার মাঝে অসীমের সুর শুনতে।

টিপ্পনী

লেখক পরিচিতি : প্রিয়দারঞ্জন রায় [১৮৮৮ - ১৯৮২]

বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক। তাঁর রচিত বহু গ্রন্থ আমাদের কাছে সমাদর লাভ করেছে।

পাঠপর্যালোচনা :

প্রিয়দারঞ্জন রায় রচিত 'বিজ্ঞান, দর্শন ও ধর্ম' - গ্রন্ধ থেকে 'মানবসভ্যতা ও বিজ্ঞান' রচনাটি উদ্ধৃত । প্রবন্ধে একজন বৈজ্ঞানিকে বিজ্ঞান মনস্কতার পরিচয় যেমন পাচছি তেমনি সমাজ ও মানবকল্যানে বিজ্ঞানের অবদান। আবার বিজ্ঞানের অপব্যবহারে কি হতে পারে তা কথাও পাচ্ছি। তিনি সুন্দর পৃথিবীকে বাসযোগ্য করার জন্য সবাইকে মানবিক দিক বিচার করে এগোনোর পরামর্শ দিয়েছেন। যুদ্ধ উন্মত্ত পৃথিবীকে ত্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে হবে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মানসিকতার ও মূল্যবোধের জায়গাটাকে আরো দৃঢ় করতে হবে যাতে পৃথিবী এবং মানবজাতিকে বাঁচানো যায়।

খ্যাতিমান বৈজ্ঞানিক প্রিয়দারঞ্জন রায়। বিজ্ঞান, দর্শন, ধর্ম বিষয়ে তার বুৎপত্তি দৃষ্টি আকর্ষন করে। 'মানবসভ্যতা ও বিজ্ঞান' এমন এক প্রান্ত যাতে প্রিয়দারঞ্জন রায়ের ৬ অনুসন্ধানী ও উদার মনস্কতার পরিচয় লভ্য। প্রথমেই শুরু করেছেন জ্ঞানের আলোকে গড়ে ওঙা মানব সভ্যতা নিয়ে। উক্ত প্রবন্ধে জ্ঞান - বিজ্ঞান, ধর্ম - দর্শনের এক সঙ্গম ঘটতে দেখা যায়। মানুষ দুর্বল জীব হলেও জ্ঞান - বিজ্ঞান চর্চায়এক অভাবনীয় ক্ষমতার শিখরে উন্মীত হয়েছে। বিজ্ঞানের আবিস্কার ও গবেষনা সমস্ত দিককে সমৃদ্ধ করে চলেছে। এই অগ্রগতি মানব কল্যানের জন্যই নিবেদিত। কিন্তু প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও পরবর্তী কালের মারণাস্ত্রের ব্যবহার ও পেশী প্রদর্শনী পৃথিবী মানবসমাজের ক্ষেত্রে এক চরমতম দুর্দিনের বার্তাবহ। প্রবন্ধকার মানবসভ্যতার বিকাশে তার জ্ঞানের পিপাসেকে দর্শন - ধর্ম ও বিজ্ঞানের পথে এগিয়ে চলার পক্ষপাতী। তাই প্রবন্ধে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার ত্রগতি কে তুলে ধরেছেন। আবার বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অপব্যবহারের দিকটি ও সামনে তুলে এনেছেন এবং শেষে মানুষের চিন্তা ও মননশীলতার মহৎ ও মহানের কথা বলেছেন।

টিপ্পনী

মানবসভ্যতা গড়ে উঠেছে জ্ঞানের আলোকে। কিন্তু মানুষ যখন তার মন ও বুদ্ধি প্রয়োগ করে জ্ঞানের পরিধি বাড়িয়ে তোলার চেষ্টা করে তখন তাকে বলা হয় বিজ্ঞান। এই জ্ঞানের সীমানা এখনো পর্যন্ত নির্দেশ করা যায় নি, এ সকল দিক লক্ষ্য করে প্রিয়দারঞ্জন রায় বিজ্ঞানের সংজ্ঞা দিলেন-

'বিজ্ঞানের সংজ্ঞা হচ্ছে এক সতত অপসৃয়মান লক্ষ্যের অভিমুখে বিরামহীন অনুসরণ।'

বিজ্ঞানের লক্ষ্য সম্বন্ধে বলা হল, পরমজ্ঞান বা পরমসত্য, যাকে জানলে আর কিছুই বাকি থাকেনা। মানুষ বুদ্ধির কৌশলে এই শক্তিকে বহুল পরিমানে বাড়িয়ে তুলতে সক্ষম। এই বিজ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে মানুষ অভূতপূর্ব অগ্রগতি ও নতুন আবিষ্কার হয়েছে তার বিভিন্ন ক্ষেত্রে আলোকপাত করেছেন। এর ফলে দূরকে করল নিকট, অজানা অধরা একে একে তার রহস্য উন্মোচনে জ্ঞানের জগতে ধরা দিতে লাগল। প্রবন্ধকার যানবাহনের বেগের পাশাপাশি দেশ-কালের ব্যবধান খর্বের কথা ও দেশ-জাতির যাতাযাত ও পন্যাদি বিনিময়ের কথা তুলে আনলেন।

বিজ্ঞানের প্রযুক্তিবিদ্যার ফলে মানুষের ব্যবহারিক জীবনের সুযোগ সুবিধার ফলে জীবনযাত্রার মানোন্ময়নের ঘটেছে, বিভিন্ন শাখার দৃষ্টান্ত প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ হয়েছে-
আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রসঙ্গ - কোয়াসার (Quasar), পালসার (Pulsar), ব্ল্যাকহোল (Black hole) প্রভৃতি নক্ষত্র বিষয়ক আলোচনা যা ছিল এতদিন কল্পনাটীত তা মানুষের জ্ঞানের আওতায় আসল।

পদার্থবিদ্যা ও রসায়নবিদ্যা সংক্রান্ত : আলোচনা, গামা রশ্মি, X- রশ্মি, রেড়িও তরঙ্গ, বিদ্যুৎ চৌম্বক শক্তির বিকিরন প্রক্রিয়া প্র্যুতি পরীক্ষা নিরিক্ষা সম্ভব হয়েছে। রসায়নে ত্রিমাত্রিক আনবিক গঠন, আনবিক কোয়ানটাসতত্ত্ব ইত্যাদির প্রসঙ্গ উঠে এল।

ভূবিজ্ঞানে গবেষনা বিষয়ে লিখলেন - পৃথিবীর গঠন সম্পর্কে নতুন তথ্য জানাগেল যেমন বিবিধ শিলা ও ভূপৃষ্ঠের শিলাস্তরের গঠন।

জীববিজ্ঞানের অভূতপূর্ব অগ্রগতি দিকগুলি :- জিনের (gene) রাসায়নিক ভিত্তির উপলব্ধি, জিন থেকে প্রোটিন পদার্ধে সৃষ্টি। জীবকোষের গঠন ও প্রক্রিয়া সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ। ক্রোমোজোম, অর্গানেলস্ সমওকীর্য জ্ঞান এবং পূর্নাবয়ব জীবের উৎপত্তি।

চিকিৎসাবিজ্ঞান ও উন্নতি করেছে তা বলতে গিয়ে দেহের পুষ্টি, রোগজীবানুর (bacteria) সংক্রমন এবং 'রোগোৎপাদক কয়েক জাতীয় বিষের (virus) সংক্রমণ, যাদের

প্রতিষেধক পদ্ধতি হচ্ছে টীকা দেওয়ার ব্যবস্থায় (vaccination)।' এর সঙ্গে প্রতিবন্ধকতা ও অনগ্রসরতার দিকটি ও বললেন - মস্তিষ্কের পোষের সমাবেশ ও প্রক্রিয়া বিষয়ক জ্ঞান বেশিদূর অগ্রসর হয় নি।

টিপ্পনী

বর্তমান যুগের নব আবিষ্কার Computer. লেখক যে সময়ের কথা বলছেন তখন Computer জটিল অঙ্ক কয়েক মিনিটেই সমাধান হয়ে যেত। এখন তা আর গণনার মধ্যে আটকে নেই তথ্য প্রযুক্তি থেকে শুরু করে বিজ্ঞানের, সাহিত্যের শিল্পের এমন কোন স্তর নেই যেখানে Computer এর ব্যবহার নেই।

জ্ঞান অর্জনের জন্য বিজ্ঞানচর্চা - 'Science for its own sake'। এই জ্ঞানকে সমাজকল্যান ও মানবউন্নয়নের সকলক্ষেত্রে তার প্রয়োগ ঘটলে জীবনযাপনের মান উন্নত হবে তা ঠিক।

'আধুনিক প্রয়োগবিজ্ঞান বা প্রযুক্তিবিদ্যা শুধু যে ব্যবহারিক জগতে আমাদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন করেছে তা নয়, মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির পরম উৎকর্ষ সাধন করেছে।'
প্রযুক্তিবিদ্যা আজ আমাদের জীবনের সকল ক্ষেত্রকে গ্রাস করেছে। পরিবহন, শিক্ষাবিধি, স্বাস্থোন্নতি, কৃষিকর্ম, নির্মান ক্ষেত্রে ব্যবহার মানুষের পরিশ্রমকে লঘু করেছে। বিজ্ঞানের সব পেয়ছির দেশে আমরা যেমন বাস করছি তেমনি তার বিপরীত দিকটি ও তুলে ধরেছেন।

বিজ্ঞানের শক্তিকে কাজে লাগিয়ে মানুষ ক্ষমতা ও সম্পদের ব্যবহার করছে দানব মনোবৃত্তি নিয়ে যা মানব সভ্যতার পক্ষে হানিকর। তার দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে দুটি মহাসাগরে ব্যবহৃত পারমানবিক ও হাইড্রোজেন বোমা ও অন্যান্য মারনাস্ত্রের ব্যবহার প্রসঙ্গ উঠে এসেছে। সমস্ত বিশ্ব জুড়ে এখন যেন একটা ঠান্ডা যুদ্ধের বাতাবরন। প্রসঙ্গক্রমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত রাষ্ট্রের মজুত বোমার উদাহরণ দেওআ হয়েছে। এখন মধ্য এশিবা, পশ্চিম এশিয়া রাষ্ট্রগুলি যুদ্ধ উন্মুখ তাদের এই আগুন নির্বাদিত করার কোন লক্ষণ দেখা যায় না। চীন ও এই প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়েছে। পৃথিবীর অণ্যাণভ দেশ সম্পর্কে বললেন -

'পৃথিবীর প্রতিটি স্বাধীন রাষ্ট্রই আজ আপন আপন নিরাপত্তার অজুহাতে পারমানবিক বোমা ও অন্যান্য মারনাস্ত্রে নিমর্মানে প্রয়াসী হয়ে উঠেছেন।'

প্রবন্ধকার তাঁর বাস্তব অভজ্ঞতা দিয়ে বুঝেছেন -

'বলা যায় পৃথিবির বর্তমান সভ্যতা অপ্রতিহত গতিতে এগিয়ে চলেছে এক বিপুল সংকট সংকুল অবস্থার অভিমুখে।'

আমাদের সভ্যতা দিন দিন ভেঙে যাচ্ছে এবং শাশ্বত মূল্যবোথ থূলিসাৎ হচ্ছে। মানুষের চাহিদা ও ক্ষমতার সীমাহীন লোভেই দ্বন্দ-দুঃখ দুর্দশার মূল কারণ। এর থেকে মানবসভ্যতাকে বাঁচাতে

টিপ্পনী

এবং 'মানুষের কল্যানের জন্য পার্থিব সমৃদ্ধিকে প্রতিষ্ঠিত ও নিয়ন্ত্রিত করতে হয়ে আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও নীতিবোধের প্রভাবে। এ প্রসঙ্গে বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী Albert Einstein উক্তি গ্রহন করেছেন -

'Science is lame without Religion, and Religion is blind without Science.'

প্রিয়দারঞ্জন রায় সপ্তদশ শতাব্দীর ফরাসী বিজ্ঞানী ও দার্শনিক প্যাসকেল এর 'পেনসিজ' গ্রন্থের উক্তি তুলে ধরেছেন। চিন্তাশক্তির জোরে মানুষ ব্রহ্মান্ড জানার চেষ্টায় ব্যাস্ত।

প্রাবন্ধিক মানবসভ্যতাকে বাঁচাতে বিজ্ঞানের অপব্যবহার নিয়ে চিন্তিত । আগামী দিনের অশুভ সংকেত তিনি দিয়েছেন -

'মনুষ্যত্বের ঘোরতর অবনমনে এক পারমানবিক প্রলয়ঙ্কর বিশ্বব্যাপী যুদ্ধবিগ্রহের অভিমুখে অগ্রসর হয়ে মানব সমাজ ও সভ্যতার বিলোপ ঘটাবে।'

বিশেষ জ্ঞানের অনুশীলনের ফলেই উৎকর্ষ সাধনের কৃতিত্ব মানুষ অর্জন করেছে। এই জ্ঞানকে জীবনের মূল্যবোধের সঙ্গে মেলাতে হবে। মানুষ বিশ্বভূবনের তুলনায় ক্ষুদ্র অনুর থেকে ক্ষুদ্র হয়ে ও "চিন্তা ও মননশীলতার প্রভাবে মহৎ থেকে ও মহানের (মহতো মহীয়ান্) কল্পনা করে তার উপলব্ধির প্রয়াসী হওয়াই সবচেয়ে বড় আশ্চর্য। এই হলো বিজ্ঞানের সাধনা ও অপরপক্ষে ধর্মের ও সাধনা।"

আদর্শ প্রশ্নমালা :

ক. 'বিজ্ঞান' সম্পর্কে প্রিয়দারঞ্জন রায়ের বক্তব্য পরিস্ফুট কর।

খ. বিজ্ঞান ও দর্শনের জানাকে তিনি (প্রাবন্ধিক) কিভাবে ব্যাখ্যা করেছেন আলোচনা কর।

গ. বিজ্ঞানের সাম্প্রতিক অগ্রগতির যে ছবি প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ তা পর্যালোচনা কর।

ঘ. 'Science for its own sake'- হলেও অর্জিত জ্ঞানককে মানবকল্যানে ও সমাজ উন্নয়নে কিভাবে প্রয়োগ করা সম্ভব আমোচ্য প্রবন্ধ অবলম্বনে লেখ।

ঙ. বিজ্ঞান চর্চার ফলে মানুষের হাতে যে ক্ষমতা এসেছে তার দানবিক মনোবৃত্তির উদাহরন সহ আলোচনা কর।

চ. 'পৃথিবীতে দুর্বলতম জীব হয়েও অভূতপূর্ব কৃতিত্ব ও প্রতিপত্তি অর্জনে সক্ষম হয়েছে।' - কার সম্পর্কে এ কথা বলা হয়েছে? কি ভাবেই বা তা সম্ভব হয়েছে লেখ।

বাংলার নবজাগরনের সূচনা

কাজী আবদুল ওদুদ

টিপ্পনী

উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে যে ব্যাপক জাগরন ঘটে তা কথা ভাবতে গিয়ে স্বতঃই মনে পড়ে ইউরোপের সুবিখ্যাত রেনেসাঁসের কথা।

মধ্যযুগের শেষের দিকে পশ্চিম-ইউরোপের ফ্রান্স, ইতালি, ইংল্যান্ড, জার্মানি এবং আরো কয়েকটি দেশে মানুষের অন্তর ও বাহির দুই ক্ষেত্রেই কয়েক শতাব্দী ধরে চলে নতুন নতুন উদ্যম - কাব্যকলা দর্শনবিজ্ঞান এসব ক্ষেত্রে ঘটে বহু প্রাচীন সম্পদের সঙ্গে নতুন পরিচয় আর নতুন নতুন সৃষ্টি, ভারতবর্ষ ও আমেরিকার মতো দূর দূরান্তের দেশ হয় আবিষঋত, আর বহু-কাল- ধরে-চলে-আসা ধর্মব্যবস্থা প্রায় আগাগোড়া বদলে যায়। এইসব ঘটনা যা ঘটে বা ঘটাবার চেষ্টা যা হয় তার সবটাই যে ভালো, অর্থাৎ বাঞ্ছনীয়, হয়েছিল তা বলা যায় না ; বরং সময় সময় অবাঞ্ছিত অনেক ব্যাপারও এই যুগের লোকদের জীবনে দেখা দিয়েছিল, তবু মোটের উপরে, চতুর্দশ শতাব্দী থেকে ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত, অথবা ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাবঈ পর্যন্ত, এক অসাধারণ-প্রাণসমৃদ্ধ ধারাবাহিক প্রচেষ্টা যে এইসব দেশে লক্ষণীয় হয়েছিল, তা সর্ববাদিসম্মত বলা চলে।

এই অভিব্যক্তির সাধারণ নাম রেনেসাঁস, অর্থাৎ নবজন্ম। সাধারনত তিনটি ধারায় ভাগ কর দেখা যেতে পারে এই নবজন্মকে - প্রাচীন জ্ঞান ও কাব্য-কলার নতুন আবিষ্কার, জীবন সম্বন্ধে মানুষের নতুন আশা আনন্দ, ধর্ম বা জীবনাদর্শ সম্বন্ধে নতুন বোধ। এই নবজন্মের বা ব্যাপক জাগরণের প্রভাব হয়েছিল সুদূরপ্রসারী - প্রধানত এর সাহায্যে ইউরোপ, অথবা পাশ্চাত্যজগৎ, তা সভ্যতা ও সংস্কৃতির মধ্যযুগীয় খোলস চুকিয়ে দিয়ে আধুনিক হয়ে ওঠে।

উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলায় যে জাগরণ ঘটে তাও এমনি একটা রেনেসাঁস ; তার প্রভাবও হয়েছিল সুদূরপ্রসারী - সমস্ত ভারতবর্ষ তার দিকে তাকিয়েছিল বিস্ময়বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে, ধর্ম সংস্কৃতি সাহিত্য রাজনীতি রাষ্ট্রীয় আদর্শ, সব ক্ষেত্রেই নবীন ভারতে যে রূপান্তর ঘটল তার মূলে এক বড়ো শক্তিরূপে কাজ করেছে এই রেনেসাঁস।

কিন্তু এই জাগরণ সম্বন্ধে যোগ্য চেতনার অভাব একালে সুস্পষ্ট - বাংলার বাইরে তো বটেই, বাংলার বুদ্ধিজীবীরাও এ-সম্বন্ধে যে চেতনার পরিচয় দিচ্ছেন তা ক্ষীণ। এর একটি কারণ মনে হয় এই বিংশ শাব্দীর প্রথম দশকের স্বদেশী আন্দোলন এই জাগরণ নিজেকে জানান দেয় এক অসাধারণ বিক্রমে ; কিন্তু তারপর বাংলায় শুরু হয় এক উন্মাদনার

টিপ্পনী

কাল - সন্ত্রাসবাদ, রাজরোষ, সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা এমনি বিচিত্রমূর্তির উন্মাদনার দীর্ঘকালব্যাপী রাজত্ব। সেই প্রলয়রাত্রির অবসান হয়েছে টে, তার পর ঘটেছে স্বাধীনতার নব অরিণোদয় ; কিন্তু সাধারণভাবে আজও বাংলার ও বাঙালীর অবস্থার তুলনা হতে পাএ অশেষ দুর্ভোগ সন্তানের জন্ম দিয়ে মাতর যে দশা হয় তার সঙ্গে।

হয়তো স্েইজনয়্ই যে জাগরণ বালার ও সমস্ত দেশের এমন সৌভাগ্যের মূলে, তাকে যোগ্য অভিনন্দন জানাবার আগ্রহ বাঙালীদের মধ্যেও দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু এই জাগরণ যোগ্য অভিনন্দনেরই দাবি রাখে। সেই দাবি মিটানোর উপরেই হয়তো নির্ভর করছে বাংলার ও ভারতের ভবিষ্যৎ লা যা সুন্দর মহৎ ও সার্থক, বিশেষ করে নিজেদের ইতিহাসের ভিতরে, তার খোঁজ মানুষকে নিতে হয় চিরকাল - সুন্র ও সার্থক হবার গরজ যখনই তাদের ভিতরে দেখা দেয়।

কিন্তু বাংলার এই জাগরণের সূচনা কখন থেকে ধরা হবে ? সে সম্বন্ধে উত্তর নির্ভর করে, এই জাগরণ বলতে কি বোঝা হবে প্রধানত তার উপরে। পরকালের দিক থেকে মখ ফিরিয়ে মানুষ যখন ইহকালের দিকে ভালো করে তাকিয়েছিল কখন সূচনা হয়েছিল রেনেসাঁসের, এই ধারনা থেকে কেউ কেউ কবি ভাতচন্দ্রের কাল থেকে এর সূচনা দেখেছেন। তাঁদের যুক্তি, ভারতচন্দ্রের কাব্যে দেব-দেবীরা মানব মানবী হয়ে উঠেছেন। কিন্তু এ মত গ্রহণযোগ্য নয়, তার কারণ, যে মানবিকতা রেনেসাঁসের মূল্য বহন করে, অর্থাৎ বিকাশধর্মী মানবিকতা অনেকটা তাঁর পরবর্তীকালের কবি খেউড়ের পতনধর্মী মানবিকতার সঙ্গে তুলনীয় - ভারতচন্দ্রে বহু আগে থাকতে মঙ্গলমাব্যগুলোতে দেবতার এই ধরনের মানবিকতার চিত্রিত হয়ে আসছিল। বলা বাহুল্য, বাংলার একালের জাগরণে এই ধরনের মানবিকতার প্রতিবাদ অবশ্য নীরব নত্রত্যয়-সমৃদ্ধ প্রতিবাদ - সুস্পষ্ট। ভারতচন্দ্রের পরে অষ্টাদশ শতাব্দীর বড়ো কবি রামপ্রসাদ। তাঁর জনপ্রিয়তা আজও ব্যাপক এবং গভীর ; আর বাংলার রেনেসাঁসের অন্যতম ধুরন্ধর পরমহংস রামকৃষ্ণ মুখ্যত তাঁর ভাবধারায় বর্ধিত। তবু রামপ্রসাদ থেকেও এই জাগরণের সূচনা ধরা যায় না ; কেননা রামপ্রসাদের জীবনবোধ ও সাধনা প্রধানত মধ্যযুগীয় ও ইহবিমুখ, কিন্তু বাংলার জাগরনের একটি বড়ো ঘোষনা 'বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়'। বাংলায় ইংরেজের রাজত্ব ও নতুন যন্ত্রপাতির আমদানি থেকেও ইংরেজের রাজ্যলাভ ঘটেছিল, নতুন যন্ত্রপাতির আমদানিও হয়েছিল, কিন্তু সেসব জায়গায় রেনেসাঁস দেখা দেয় নি ল ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভের ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ থেকেও এই রেনেসাঁস আরম্ভ ভাবা যায় না, কেননা ফোর্ট উইলিয়ম ছিল বিদেশী শাসকদের প্রয়োজনে গড়া প্রতিষ্ঠান মাত্র, তাতে বাংলা গদ্যের গোড়াপত্তনের সহায়তা যা হয়েছিল তার ঐতিহাসিক মূল্য আছে, কিন্তু সাহিত্যিক মূল্য কিছু যে আছে তা স্বীকার করা কঠিন - অন্তত তার প্রভাব বাংলার জীবন অথবা সাহিত্যের উপরে কিছু

পড়ে নি অথবা যা পড়েছে তা সামান্য। রেনেসাঁস অর্থাৎ কোনো জাতির বাদেশের ব্যাপক জাগরণ, মুখ্যাত চিৎ-সম্পদ, বস্তুসম্পদ তাতে কম অর্থপূর্ণ নয়, কিন্তু তা অনুষঙ্কিক - এই গোড়ার কথাটা ভুললে বস্তুর ও ঘটনার অরণ্যে দিশাহারা হওয়াই আমাদের ভাগ্য।

টিপ্পনী

বাংলার এই জাগরনের সূচনা জগতের অন্যম শ্রষ্ঠ মনুষ্যত্বসাধক রামমোহন রায়ের কলকাতায় বসবাস থেকে, আরো ঠিক ঠিক বলে গেলে তাঁর বেদান্তগ্রন্থ ও তার ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশের কাল থেকে, অর্থাৎ ১৮১৫ - ১৬ খৃষ্টাব্দ থেকে - এ মত স্বীকার্য বলেই মনে হয়। এই বেদান্তগ্রন্থ প্রকাশে পূর্বেই রামমোহনের গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ অথবা পুস্তিকা 'তুহফাতুল্ মুওহ্হিদীন' (একেশ্বরবাদীদের জন্য উপহার) প্রকাশিত হয়েছিল, রংপুরে অবস্থানকালে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী লোকদের সঙ্গে আলোচনা ও বাদ-প্রতিবাদও তাঁর হয়েছিল, প্রবল প্রতিপক্ষও তাঁর সেখানে জুটেছিল ; তবুও তাঁর কলকাতায় বসবাস ও বেদান্তগ্রন্থ প্রকাশই বাংলার রেনেসাঁসের মূল ঘটনা বলে গণ্য হবার যোগ্য এই কারণে যে, দেশের বহুলোকের মধ্যে একটা নতুন চেতনার সূচনা হয়। এর থেকে, আর নিকটের ও দূরের অনেক জ্ঞানী গুণী বিদেশীদের মনেও নতুন করে একটা চমক লাগল পুরাতন ভারতবর্ষ সম্বন্ধে। রামমোহনের বেদান্তগ্রন্থ অবশ্য ধর্মসংস্কার-মূলক, কিন্তু রামমোহন ধর্ম বলতে যা বুঝেছিলেন তা বিধিবিধান-সর্বস্ব বা পরকাল-সর্বস্ব ব্যাপার যে নয়, বরং প্রধানত জীবনের উৎকর্ষ সাধনের ব্যাপার, অচিরে তাঁর বহুমুখী প্রচেষ্টায় তা স্পষ্ট হয়ে উঠল।

লেখক পরিচিতি : কাজী আবদুল ওদুদ [১৯৮৪ - ১৯৭০]

জন্ম : নদীয়া সীমান্তবর্তী ফরিদপুর জেলা। শৈশবে পিতৃগৃহ ও কৈশোর বয়স মাতুলালয়ে কাটিয়েছেন।

স্কুল : প্রধানত ঢাকা জেলায়। কলেজ জীবন কেটেছে কলকাতায় (প্রেসিডেন্সি)। তিনি যখন বি. এ ক্লাসে পড়েন তখন তার বিবাহ সম্পন্ন হয়। প্রসিডেন্সিতে পড়াকালীন তাঁর সহপাঠীরা হলেন - সুভাষচন্দ্র, প্রমথনাথ সরকার, নীরেন রায়, ক্ষেত্রেশ চট্টোপাধ্যায়, দেবেন ব্যানার্জী প্রমুখেরা।

তাঁর সৃষ্টির জগত :

প্রথম রচনা : 'বিরাজ বৌ' এর সমালোচনা ভারতবর্ষে -১৩২২.

প্রথম গ্রন্থ : 'মীর পরিবার' (গল্পের বই) - ১৩২৫

দ্বিতীয় গ্রন্থ : 'নদীবক্ষে' (উপন্যাস) - ১৩২৬ এ ছাড়া নবপর্যায়ে দ্বিতীয় খন্ড - ১৯২৯, সমাজ ও সাহিত্য - ১৯৩৪, ইন্দু মুসলমানের বিরোধ - ১৯৩৫, অজকের কথা - ১৯৪১, বাংলার

টিপ্পনী

জাগরন - ১৯৫৬, 'কবিগুরু গ্যেটে' (দু'খন্ড)।

অর্থনীতির ছাত্র হলেও সাহিত্য ও সমালোচনায় কৃতিত্ব রেখে গেছেন। গ্যেটে, রবীন্দরনাথ, শরৎচন্দ্র সম্পর্কে আলোচনা খুবই গুরুত্বপূর্ন হল অন্নদাশংকর রায়ের ওদুদ সম্পর্কে মূল্যাবণ:

'কাজী আবদুল ওদুদ ছিলেন জাতিতে ভারতীয়, ভাষায় বাঙালী, ধর্মে মুসলমান, জীবনদর্শনে মানবিকবাদি রামমোহন পন্থী, সাহিত্যে গ্যেটে ও রবীন্দ্রপন্থী, রাজনিতিতে গান্ধী ও নেহেরুপন্থী, অর্থনৈতিক শ্রেণীবিচারে মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক, সামাজিক ধ্যানধারনায় ভিক্টোরিয়ান লিবারল'।

পাঠপর্যালোচনা:

'বাংলার নবজাগরনের সূচনা' শীর্ষক বিষয়টি কাজী আবদুল ওদুদের 'বাংলার জাগরণ' (১৯৫৬) গ্রন্থ থেকে সংকলিত। বাংলার যে জাগরন ঘটেছিল সে বিষয় সম্পর্কে তাঁর মননশীল আলোচনা রয়েছে উক্ত প্রবন্ধে। উনবিংশ শতাব্দীতে যে জাগরণ ঘটেছিল বাংলাদেশ জুড়ে সে কথা ভাবতে গিয়ে রেনেসাঁসের প্রসঙ্গ এসে পড়ে। এই নবজাগরনশুধু একটা বাহ্যিক ব্যাপার নয়, আভ্যন্তরীন তা অনুভব করে পশ্চিম ইউরোপের দেশ গুলির মানুষের অন্তর ও বাইরের উভয় ক্ষেত্রেই কয়েক শতাব্দী জুড়ে চলে আসা নতুন নতুন উদ্যোমে ও শৃষ্টির কথা বলা হয়েছে। এই সুবিখ্যাত রেনেসাঁসের ফলে দর্শন-বিজ্ঞান-কাব্যকলা সকল ক্ষেত্রে ঘটে 'বহু প্রাচীন সম্পদের সঙ্গে নতুন পরিচয় আর নুতন নতুন সৃষ্টি, ভারতবর্ষ ও আমেরিকার মতো দুর দূরান্তের দেশ হয় - আবিষ্কৃত, আর বহুকাল ধরে চলে আসা ধর্মব্যবস্থা প্রায়আগাগোড়া বদলে যায়।' একে বলা হয়েছে 'অসাধারন -প্রাণসমৃধ' ধারাবাহিক এক প্রচেষ্টা। এই 'রেনেসাস' বা 'নবজন্ম' কে তিনটি ধারায় বিভক্ত করা হয়েছে -

(ক) প্রাচীন জ্ঞান ও কাব্য কলার নতুন আবিষ্কার।
(খ) জীবন সম্বন্ধে মানুষের নতুন আশা আনন্দ।
(গ) ধর্ম বা জীবনাদর্শ সম্বন্ধে নতুন বোধ।

নবজাগরের সুদূরপ্রসারী প্রভাব আবদুল ওদুদ অনুধাবন করে জানালেন - 'এই নবজন্মের বা ব্যাপাক জাগরনের প্রভাব হয়েছিল সুদূরপ্রসারী - প্রধানত এর সাহায্যে ইউরোপ, অথবা পাশ্চাত্য জগৎ, তার সভ্যতা ও সংস্কৃতি মধ্যযুগীয় খোলস চুকিয়ে দিয়ে আধুনিক হয়ে ওঠে।'

ভিতরেও বাইরে এই আধুনিক হয়ে ওঠার ওপর ওপর প্রাবন্ধিকের প্রযন্ত বেশি বলে

মনে হয়, উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলায় যে জাগরন ঘটে তাকে ও রেনেসাঁস আখ্যাদেওয়া হয়েছে, যার প্রভাব সুদুর প্রসারী, বাংলায় এই জাগরণের দিকে তাকিয়ে ছিল সমগ্র ভারত। আমাদের সমগ্র ভারতে যে চিন্তা চেতনার বিপ্লব ঘটল তাই রেনেসাস। তবে ওদুদ এই জাগরণ সম্বন্ধে আমাদের বুদ্ধিজীবিদের ক্ষীণ চেতনার পরিচয় কথা বললেন। স্বদেশী আন্দোলনে জাগরনের বিক্রম দেখাগেলেও বাংলার উন্মাদনার জালে তা আটকে গেছে ল বাঙালীদের মধ্যে সেই সৌভাগ্যসূচক জাগরণকে যোগ্য অভিনন্দন জানাবার আগ্রহজ বাঙালীদের মধভে দেখা যাচ্ছে না বলে মনে করেছেন প্রাবন্ধিক। এই খামতির কথাটা স্পষ্ট ভাষায় জানালেন।

ওদুদ তাঁর প্রবন্ধে জাগরনের সূচনা সম্পর্কে বললেন, যারা মনে করেন মানুষ যখন ইহকালের দিকে ভালো করে তাকিয়ে ছিল তখনই শুরু হয় রেনেসাঁস ল কবি ভারতচন্দ্রের দেবদেবী মানব মানবী হয়ে উঠেছে একথা মাননেন না। রামপ্রসাদ বা ফোর্টউলিয়াম কললেজকে ও রেনেসাঁসের স্থান দিলেন না; এই রেনেসাঁস একটা জাতির বা দেশের ব্যাপক জাগরণ, সব দিক থেকে এই জাগরণ ঘটে।

কাজী আবদুল ওদুদের দৃষ্টিতে বাংলার নবজাগরণের সূচনাতে আছে 'শ্রেষ্ঠ মনুষ্যত্বসাধক রামমোহন রায়ের কলকাতায় বসবাস থেকে, আরো ঠিক ঠিক বলতে গেলে তাঁর বেদান্তগ্রন্থ ও তার ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশের কাল থেকে, অর্থাৎ ১৮১৫ - ১৬ খৃষ্টাব্দ থেকে - এ মত স্বীকার্য বলেই মনে হয়।' রামমোহন রায়ের একেশ্বরবাদ তাকে আকর্ষন করেছিল। 'বেদান্ত গ্রন্থ' দেশের মেনুষের মধ্যে নতুন চেতনার সূচনা করল। যার ফলে -''নিকট ও দূরের অনেক জ্ঞানী গুনী বিদেশীর মনে ও নতুন করে একটা চমক লাগল পুরাতন ভারতবর্ষ সম্বন্ধে।' রামমোহন রায়ের বেদান্তগ্রন্থ ধর্মসংস্কার মূলক গ্রন্থ যাতে 'প্রধানত জীবনের উৎকর্ষ সাধনের ব্যাপার', লিপিবদ্ধ হয়েছে।

এই নতুন চেতনাই প্রাবন্ধিকের নবজাগরনে তবে তাঁর এই মন্তব্য নিয়ে সমালোচনা ও হয়েছে বিস্তর, আনিসুজুমান তাঁর 'কাজী আবদুল ওদুদ : মন ও মনন' - প্রবন্ধে মন্তব্য করলেন -

'উনিশ শতকের বাংলার জাগরণকে তিনি বলেছেন রেনেসাঁস - এ সম্পর্কে বেশ কিছু কাল ধরে বিতর্ক চলেছে। কিন্তু সে তর্ক এ ক্ষেত্রে নিষ্ফল এই কারনে যে, আবদুল ওদুদের মতে, এই জাগরণ সম্পর্কে যথাযোগ্য চেতনার অভাব আমাদের মধ্যে পধরকট। দ্বিতীয় কারণ, এর অন্তনীহিত দুর্বলতা রামমোহন রায়ের যে দুটি দিক তাঁকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল, তা হলো নিরাকার উপাসনা - প্রচলনের প্রবাস আর বিচার বুদ্ধি ও লোকাত্রয়ের আলোকে শান্তবিচারের উদ্‌যোগ।'

রেনেসাঁস - নবজাগরণ নবজন্ম সম্বন্ধে ওদুা পরিচয় আমরা এই প্রবন্ধে পেলাম।

টিপ্পনী

সচেতন দৃষ্টিতে নবজাগরনের বিচার করার পক্ষপাতি তিনি , তবে নবজাগরণ ইউরোপে থেকে আর বাংলায় হোক তাকে অভিনন্দন জানানোর কথা বললেন। তাতে দেশের জাতির কল্যান সাধিত হয়ে একথা তিনি নিশ্চয় অনুধাবন করেছিলেন।

আদর্শ প্রশ্নমালা :

ক. রেনেসাঁস সম্পর্কে সাধতারণ ধারণার পরিচয় দাও।

খ. মধ্যযুগে পশ্চিম ইউরোপে যে রেনেসাঁসের সূচনা হয়েছিল তার পরিচয় দাও।

গ. আবদুল ওদুদ নবজন্মকে কয়টি ভাগে ভাগ করেছেন আলোচনা কর।

ঘ. ‘পরকালের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে মানুষ যখন ইহকালের দিকে ভালো করে তাকিয়েছিল তখন সূচনা হয়েছিল রেনেসাঁসের,’ - কার উক্তি ? উদ্ধৃত অংশটি কোথা থেকে নেওয়া হয়েছে? বক্তব্যটির মর্ম ব্যাখ্যা কর।

ঙ. প্রকৃত নবজাগরণের সূচনা কখন থেকে বলে মনে করেছেন কাজী আবদুল ওদুদ তা বর্ণনা কর।

ছুটি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

টিপ্পনী

বালকদিগের সর্দার ফটিক চক্রবর্তীর মাথায় চট করিয়া একটা নূতন ভাবোদয় হইল ; নদীর ধারে একটা প্রকান্ড শালকাষ্ঠ মাস্তুলে রূপান্তরিত হইবার প্রতীক্ষায় পড়িয়া ছিল ; স্থির হইল, সেটা সকলে মিলিয়া গড়াইয়া লইয়া যাইবে।

যে ব্যাক্তির কাঠ, অবশ্যককালে তাহার কতখানি বিষ্ময়, বিরক্তি এবং অসুবিধা নবোধ হইবে, তাহাই উপলব্ধি করিয়া বালকেরা এ প্রস্তাবে সম্পূর্ন অনুমোদন করিল।

কোমর বাঁধিয়া সকলেই যখন মনোযোগের সহিত কার্যে প্রবৃত্ত হইবার উপক্রম করিতেছে এমন সময় ফটিকের কনিষ্ঠ মাখনলাল গম্ভীরভাবে সেই গুঁড়ির উপরে গিয়া বসিল ; ছেলেরা তাহার এইরূপ উদার ঔদাসীন্য দেখিয়া কিছু বিমর্ষ হইয়া গেল।

একজন আসিয়া ভয়ে ভয়ে তাআকে একটু-আধটু ঠেলিলে কিন্তু তাআতে কিছুমাত্র বিচলিত হইল না ; এই অকাল তত্ত্বজ্ঞানী মানব সকল প্রকার অসারতে সম্বন্ধে নীরবে চিন্তা করিতে লাগিল।

ফটিক আসিয়া আস্ফালন করিয়া কহিল, 'দেখ, মার খাবি। এইবেলা ওঠ্।

সে তাহাতে আরো একটু নড়িয়া চড়িয়া আসনটি বেশ স্থায়ীরূপে দখল করিয়া লইল।

এরূপ স্থলে সাধারণের নিকট রাজসম্মান রক্ষা করিতে হইলে আবাধ্য ভ্রাতার গন্ডদেশে অনতিবিলম্বে এক চড় কষাইয়া দওয়া ফটিকের কর্তব্য ছিল - সাহস হইল না। কিন্তু এমন একটা ভাব ধারণ করিল, যেন ইচ্ছা করিলেই এখনি উহাকে রীতিমত শাসন করিয়া দিতে পারে কিন্তু করিল না, কারণ পূর্বাপেক্ষা আর-একটা ভালো খেলা মাধাব উদয় হইবাচে, তাহাতে আর একটু বেশি মজা আছে। প্রস্তাব করিল, মাখনকে সুদ্ধ ঐ কাঠ গড়াইতে আরম্ভ করা যাক।

মাখন মনে করিল, ইহাতে তাহার গৌরব আছে ; কিন্তু অন্যান্য পার্থিব গৌরবের নায় ইহার আনুষঙ্গিক যে বিপদের সম্ভাবনাও আছে, তাহা তাহার কিংবা আর কাহারও মনে উদয় হয় নাই।

ছেলেরা কোমর বাঁধিয়া ঠেলিতে আরম্ভ করিল - 'মারো ঠেলা হেঁইয়ো, সাবাস জোয়ান

টিপ্পনী

হেঁইয়ো।' গুড়ি একপাক ঘুরিতে না ঘুরিতে মাখন তাহার গাম্ভীর্য, গৌরব এবং তত্ত্বজ্ঞানসমেত ভূমিসাৎ হইয়া গেল ল

খেলার আরম্ভেই এইরূপ আশাতিত ফললাভ করিয়া অন্যান্য বালকের বিশেষ হৃষ্ট হইয়া উঠিল, কিন্তু ফটিক কিছু শশব্যস্ত হইল। মাখন তৎক্ষনাৎ ভূমিসয্যা ছাড়িয়া ফটিকের উপরে গিআ পড়িল, একেরারে অন্ধভাবে মারিতে লাগিল। তাহার নাকে মুখে আঁচড় কাটিয়া কাঁদিতে কাাদিতে গৃহাভিমুখে গমন করিল। খেলা ভাঙিয়া গেল।

ফটিক গোটাকতক কাশ উৎপাটন করিয়া ল্ইয়া একা অধর্ধনিমগ্ন নৌকার গলুইয়ের উপরে চড়িয়া বসিয়া চুপচাপ করিয়া কাশের গোড়া চিবা্ইতে লাগিল।

এমন সময় একটা বিদেশী নৌকা ঘাটে আসিয়া লাগিল। একটি অর্ধবয়সী ভদ্রলোক কাঁচা গোঁফ এধং পাকা চুল লইয়া বাহির হইয়া আসিলেন। বালককে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'চক্রবর্তীদের বাড়ি কোথায়।'

বালক ডাঁটা চিবাইতে চিবাইতে কহিল, 'ঐ হোথা।' কিন্তু কোন্দিকে যে নির্দেশ করিল কাহারাও বুঝিবার সাধ্য রহিল না।

ভদ্রলোকটি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কোথা।'

সে বলিল, জানি নে।' বলিয়া পূর্ববৎ তৃনমূল ইতে রসগ্রহনের প্রবৃত্ত হইল। বাবুটি তকন অন্য লোকের সাহায্য অবলম্বন করিয়য়া চক্রবর্তীদের গৃহের সন্ধানে চলিলেন।

অবিলম্বে বাঘা বাগদি আসিয়া কহিল, 'ফটিকদাদ, মা ডাকছে।'

ফটিক কহিল, 'যাব না।'

বাঘা তাহাকে বলপূর্বক আড়কোলা করিয়া লইয়া গেল, টিক নিষ্ফল আক্রোশে হাত পা ছুঁড়িতে লাগিল।

ফটিককে দেখিবামাত্র তাহার মা অগ্নিমূর্তি হইয়া কহিলেন, 'আবার তুই মাখনকে মেরেছিস!'

ফটিক কহিল, 'না, মারি নি।'

'ফের মিথ্যে কথা বলছিস!'

'কখ্খনো মারি নি। মাখনকে জিজ্ঞাসা করো।'

মাখনকে প্রশ্ন করাতে মাখন আপনার পুর্ব নালিশ সমর্থন করিয়া বলিল, 'হাঁ, মেরেছে।'

তখন আর ফটিকের সহ্য হিল না। দ্রুত গিয়া মাখনকে এক সশব্দ চড় কষাইয়া দিআ কহিল, 'ফের মিথ্যে কথা।'

মা মাখনের পক্ষ লইয়া ফটিককে সবেগে নাড়া দিয়া তাহার পষ্টে দুটা - তিনটা প্রবল চপেটাঘাত করিলেন। ফটিক মেকোকে ঠলিয়া দিল।

মা চিৎকার করিয়া কহিলেন,, 'অ্যাঁ, তুই আমার গায়ে হাত তুলিস!'

এমন সময়ে সেই কাঁচাপাকা বাবুটি ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, কী হচ্ছে তোমাদের?'

ফটিকের মা বিস্ময়ে আনন্দে অভিভত হইয়া কহিলেন, 'ওমা, এ যে দাদা, তুমি কবে এলে ল' বলিয়া গড় করিয়া প্রণাম করিলেন।

বহুদিন হইল দাদা পশ্চিমে কাজ করিতে গিয়াছিলেন, ইতিমধ্যে ফটিকের মার দুই সন্তান হইয়াছে, তাহারা অনেকটা বাড়িয়া উঠিয়াছে, তাহার স্বামীর মৃত্যু হইয়াছে কিন্তু একবারও দাদার সাক্ষাৎ পায় নাই। আজ বহুকাল পরে দাদা দেশে ফিরিয়া আসিয়া বিশ্বম্ভরবাবু তাঁহার ভগিনীকে দেখিতে আসিয়াছেন ল

কিছুদিন খুব সমারোহে গেল। অবশেষে বিদায় লইবার দুই-একদিন পূর্বে বিশ্বম্ভরবাবু তাঁহার ভগিনীকে ছেলেদের পড়াশুনা এবং মানসিক উন্নতি সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন। উত্তরে ফটিকের অবাধ্য উচ্চৃঙ্খতা, পাঠে অমনযোগ, এবং মাখনের সুশান্ত সুশীলতা ও বিদ্যানুরাগের বিবরণ শুনিলেন।

তাঁহার ভগিনী কহিলেন, 'ফটিক আমার হাড় জ্বালাতন করিয়াছে।'

শুনিয়া বিশ্বম্ভর প্রস্তাব করিলেন, তিনি ফটিককে কলিকাতায় লইয়া গিআ নিজের কাছে রাখিয়া শিক্ষা দিবেন। বিধবা এ প্রস্তাবে সহজেই সম্মত হইলেন।

ফটিককে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কেমন রে ফটিক, মামার সঙ্গে কলকাতায় যাবি?'

ফটিক লাফাইয়া উঠিয়া বলিল, 'যাব'।

যদিও ফটিককে বিদায় করিতে তাহার ম্যয়ের আপত্তি ছিল না, কারণ তাঁহার মনে সর্বদাই আশঙ্কা ছিল কোন্‌দিন সে মাখনকে জলেই ফেলিয়া দেয় কি মাআই ফাটা কি কী আকটা দুর্ঘটনা ঘটায়, তথাপি ফটিকের বিদায়গ্রহণের জন্য এতাদৃশ্য আগ্রহ দেখিয়া তিনি ঈষৎ ক্ষুণ্ন

হইলেন।

টিপ্পনী

'কবে যাবো', 'কবে যাবো' করিয়া ফটিক তাহার মামাকে অস্থির করিয়া তুলিল ; উৎসাহে তাহার রাত্রে নিদ্রা হয় না।

অবশেষে যাত্রাকালে আনন্দের ওদার্যবশত তাহার ছিপ, ঘুড়ি, লাটাই সমস্ত মাখনকে পুত্রপৌত্রদিক্রমে ভোগদখল করিবার পুরা অধিকার দিয়া গেল।

কলিকাতায় মামার বাড়ি পৌঁছিয়া প্রথমত মামীর সঙ্গে আলাপ হইল। মামী এই অনাবশ্যক পরিবারবৃদ্ধিতে মনে মনে যে বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, তাহা বলিতে পারি না। তাঁআর নিজের তিনটি ছেলে লইয়া তিনি নিজের নিয়মে ঘরকন্না পাতিয়া বসিয়া আএন, ইহার মধ্যে সহসা একটি তেরো বৎসরের অপরিচিত অশিকইত পাড়াগেঁয়ে ছেলে ছাড়িয়া দিলে কিরূপ একটা বিপ্লবের সম্ভাবনা উপস্থিত হয়। বিশ্বম্ভরের এত বয়স হইল, তবু কিছুমাত্র জ্ঞানকান্ড আছে।

বিশেষত, তের-চৌদ্দ বৎসরের ছেলের মতো পৃথিবীতে এমন বালাই আর নাই। শোভাও না, কোনো কাজেও লাগে না। স্নেহও উদ্রেক করে না, তাহার সঙ্গসুখও বিশেষ প্রার্থনীয় নহে। তাহার মুখে আধো আধো কথাও ন্যাকামি, পাকা কথাও জ্যাঠামি এবং কথামাত্রই প্রগল্ভতা। হঠাৎ কাপড়চোপড়ের পরিমাণ রক্ষা না করিয়া বেমানানরুপে বাড়িয়া উঠে ; লোকে সেটা তাহার একটা কুশ্রী স্পর্ধাস্বরূপ জ্ঞান করে। তাহার শৈশবের লালিত্য এবং কণ্ঠস্বরের মিষ্টতা সহসা চলিয়া যায়, লোকে সেজন্য তাহাকে মনে মনে অপরাধ না দিয়া থাকিতে পারে না শৈশব এবং যৌবনের অনেক দোষ মাপ করা যায়, কিন্তু এই সময়ের কোনো স্বাভাবিক অনিবার্য ত্রুটি যেন অসহ্য বোধ হয়।

সেও সর্বদা মনে মনে বুঝিতে পারে, পৃথিবীর কোথাও সে ঠিক খাপ খাইতেছে না : এইজন্য আপনার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সর্বদা লজ্জিত এবং ক্ষমাপ্রার্থী ্ইবা থাকে। অথচ এই বয়সেই স্নেহের জন্য কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত কাতরতা মনে জন্মায় ল এই সময়া যদি সে কোনো সহৃদয় ব্যাক্তির নিকট হইতে স্নেহ কিংবা সখ্য লাভ করিতে পারে, তবে তাআর নিকট আত্মাবিক্রীত হইয়া থাকে। কিন্তু তাহাকে স্নেহ কেহ করিতে সাহস করে না , কারন সেটা সাধারণে প্রশ্রয় বলিয়া মনে করে। সুতরাং তাহার চেহারা এবং ভাবখানা অনেকটা প্রভুহীন পথের কুকুরের মতো হইয়া যায়।

অতএব, এমন অবস্থায় মাতৃভবন ছাড়া আর কোনো অপরিচিত স্থান বালকের পক্ষে নরক। চারি দিকের স্নেহশূন্য বিরাগ তাহাকে পদে পদে কাঁটার মতো বিঁধে। এই বয়সে সাধারণত

নারীজাতিকে কোনো এক শ্রেষ্ঠ স্বর্গলোকের দুর্লভ জীব বলিয়া মনে ধারণা হইতে আরম্ভ হয়, অতএব তাঁহাদের নিকট হইতে উপেক্ষা অত্যন্ত দুঃসহ বোধ হয়।

মামীর স্নেহহীন চক্ষে সে যে একটা দূগ্রহের মতো প্রতিভাত হইতেছে, এইটে ফটিকের সবচেয়ে বাজিত। মামী যদি দৈবাৎ তাহাকে কোনো একটা কাজ করিতে বলিতেন তাহা হইলে মনের আনন্দ যতটা আবশ্যক তার চেয়ে বেশি কাজ করিয়া ফেলিত - অবশেষে মামী যখন তাহার উৎসাহ দমন করিয়া বলিতেন, 'ঢের হয়েছে, ঢের হয়েছে। ওতে আর তোমায় হাত দিতে হবে না। এখন তুমি নিজের কাজে মন দাও গে। একটু পড়ো গে যাও।' - তখন তাহার মানসিক উন্নতির প্রতি মামীর এতটা যত্নবাহুল্য তাহার অত্যন্ত নিষ্ঠুর অবিচার বলিয়া মনে হইত।

ঘরের মধভে এইরূপ অনাদর, ইহার পর আবার হাঁফ ছাড়িবার জায়গা ছিল না। দেয়ালের মধ্যে আটকা পড়িয়া কেবলই তাআর সেই গ্রামের কথা মনে পড়িত।

প্রকান্ড একটা ধাউস ঘুড়ি লইয়া বোঁ বোঁ শব্দে উড়াইয়া বেড়াইবার সেই মাঠ, 'তাইরে নাইরে নাইরে না' করিয়া উচ্চৈৎস্বরে স্বরচিত রাগিনী আলাপ করিয়া অকর্মণ্যভাবে ঘুরিয়া বেড়াইবার সেই নদীতীর, দিনের মধ্যে যখন তখন ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া সাঁতার কাটিবার সেই সংকীর্ন স্রোতস্বিনী, সেই সব দলবল, উপদ্রব, স্বাধীনতা এবং সর্বোপরি সেই অত্যাচারিনী অবিচারিণী মা অহর্নিশি তাহার নিরুপায় চিত্তকে আকর্ষণ করিত।

জন্তুর মতো একপ্রকার অবুঝ ভালোবাসা - কেবল একটা কাছে যাইবার অন্ধ ইচ্ছা, কেবল একটা না দেখিয়া অব্যক্ত ব্যকুলতা, গোধূলিসময়ের মাতৃহীন ব্যাসের মতো কেবল একটা আন্তরিক 'মা মা' ক্রন্দন - সেই লজ্জিত শঙ্কিত শীর্ণ দীর্ঘ অসুন্দর বালকের অন্তরে কেবলই আলোড়িত হইত।

স্কুলে এতবড়ো নির্বোধ এবং অমনোযোগী বালক আর ছিল না। একটা কথা জিজ্ঞাসা করিলে সে হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকিত। মাস্টার যখন মার আরম্ভ করিত তখন ভারাক্লান্ত গর্দভের মতোই নীরব সহ্য করিত। ছেলেদের যকন খেলিবার ছুটি হইত, তখন জানালার কাছে দাঁড়াইয়া দূরের বাড়িগুলার ছাদ নিরীক্ষণ করিত ; যখন সেই দ্বিপ্রহর রৌদ্রে কোনো একটা ছাদে দুটি-একটি ছেলেমেয়ে কিছু একটা খেলার ছলে ক্ষণেকের জন্য দেখা দিয়া যাইত, তখন তাহার চিত্ত অধীর হইয়া উঠিত।

একদিন অনেক প্রতিজ্ঞা করিআ অনেক সাহসে মামাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, 'মামা, মার কাছে কবে যাব।' মামা বলিয়াছিলেন, 'স্কুলের ছুটি হোক।' কার্তিক মাসের পূজার ছুটি সে

টিপ্পনী

টিপ্পনী

এখনো ঢের দেরি।

একদিন ফটিক তাহার স্কুলের বই হারাইয়া ফেলিল। একে তো সহজেই পড়া তৈরি হয় না, তাহার পর বই হারাইয়া একেবারে নাচার হইয়া পড়িল। মাস্টার প্রতিদিন তাহাকে অত্যন্ত মারধোর অপমান করিতে আরম্ভ করিলেন। স্কুলে তাহার এমন অবস্থা হইল যে, তাহার মামাতো ভাইরা তাহার সহিত সম্বন্ধ স্বীকার করিতে লজ্জা বোধ করিত। ইহার কোনো অপমানে তাহারা অন্যান্য বালকের চেয়েও যেন বলপূর্বক বেশি করিয়া আমোদ প্রকাশ করিত।

অসহ্য বোধ হওয়াতে একদিন ফটিক তার মামীর কাছে নিতান্ত অপরাধীর মতো গিয়া কহিল, 'বই হারিয়ে ফেলেছি।'

মামী অধরের দুই প্রান্তে বিরক্তির রেখা অঙ্কিত করিয়া বলিলেন, 'বেশ করেছ, আমি তোমাকে মাসের মধ্যে পাঁচবার করে বই কিনে দিতে পারি নে।'

ফটিক আর কিছু না বলিয়া চলিয়া আসিল - সে যে পের পবসা নষ্ট করিতেছে এই মনে করিয়া তাহার মায়ের উপর অত্যন্ত অভিমান উপস্থিত হইল ; নিজের হীনতা এবং দৈন্য তাহাকে মাটির সহিত মিশাইয়া ফেলিল।

স্কুল হইতে ফিরয়া সেই রাত্রে তাআর মাথাব্যাথা করিতে লাগিল এবং গা সিরসির করিয়া আসিল। বুঝিতে পারিল তাহার জ্বর আসিতেচে ল বুঝিতে পারিল ব্যালো বাধাইলে তাআর মামীর প্রতি অত্যন্ত অনর্থক উপদ্রব করা হইবে ল মামী এই ব্যামোটাকে যে কিরূপ একটা অকারণ অনাবশ্যক জ্বালাতনের স্বরূপ দেখিবে, তাহা সে স্পষ্ট উপলব্ধি করিতে পারিল। রোগের সময় এই অকমর্ণ্য অদ্ভুত নির্বোধ বালক পৃথিবীতে নিজের মা ছাড়া আর কাহারও কাছে সেবা পাইতে পার, এরূপ প্রত্যাশা করিতে তাহার লজ্জা বোধ হইতে লাগিল।

পরদিন প্রাতঃকালে ফটিককে আর দেখা গেল না। চতুর্দিকে প্রতিবেশীদের ঘরে খোঁজ করিয়া তগাহার কোনো সন্ধান পাওয়া গেল না।

সেদিন আবার ররাত্রি হইতে মুষলধারে শ্রাবণের বৃষ্টি পড়িতেছে। সুতরাং তাহার খোঁজ করিতে লোকজনকে অনর্থক অনেক ভিজিতে হইল। অবশেষে কোথাও না পাইয়া বিশ্বম্ভরবাবু পুলিসে খবর দিলেন।

সমস্ত দিনের পর সন্ধ্যার সময় একটা গাড়ি আসিয়া বিশ্বম্ভরবাবুর বাড়ির সম্মুখে দাঁড়াইল। তখনো ঝুপ ঝুপ করিয়া অবিশ্রাম বৃষ্টি পড়িতেছে, রাস্তায় একহাঁটু জল দাঁড়াইয়া গিয়াছে।

দুইজন পুলিসের লোক গাড়ি হইতে ফটিককে ধরাধরি করিয়া নামাইয়া বিশ্বম্ভরবাবুর নিকট উপস্থিত করিল। তাহার আপাদমস্তক ভিজা, সর্বাঙ্গে কাদা, মুখ চক্ষু লোহিতবর্ণ, থরথর করিয়া কাঁপিতেছে। বিশ্বম্ভর বাবু কোলে করিয়া তাহাকে অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন।

মামী তাহাকে দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন, 'কেন বাপু, পরের ছেলেকে নিয়ে কেন এ কর্মভোগ? দাও ওকে বাড়ি পাঠিয়ে দাও।'

বাস্তবিক, সমস্তদিন দুশ্চিন্তায় তাঁহার ভালোরূপ আহারাদি হয় নাই এবং নিজের ছেলেদের সহিতও নাহক অনেক খিটমিট করিয়াছেন।

ফটিক কঁদিয়া উঠিয়া কহিল, 'আমি মার কাছে যাচ্ছিওলুম, আমাকে ফিরিয়ে এনেছে।'

বালকের জ্বর অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিল ল সমস্ত রাত্রি প্রলাপ লাগিল। বিশ্বম্ভরবাবু চিকিৎসক লইয়া আসিলেন।

ফটিক তাহার রক্তবর্ণ চক্ষু একবার উন্মীলিত করিয়া কড়িকাঠের দিকে হতবুদ্ধিভাবে তাকাইয়া কহিল, 'মামা, আমার ছুটি হয়েছি কি?'

বিশ্বম্ভরবাবু রুমালে চোখ মুছিয়া সস্নেহে ফটিকের শীর্ণ তপ্ত হাতখানি হাতের উপর তুলিয়া লইয়া তাহার কাছে আসিয়া বসিলেন।

ফটিক আবার বিড় বিড় করিয়া বকিতে লাগিল, বলিল, মা আমাকে মারিস্ নে মা। সতভি বলছি আমি কোনো দোষ করি না।'

পরদিন দিনের বেলা কিছুক্ষনের জন্য সচচেতন হইয়া ফটিক কাহার প্রতভাশায় ফ্যালফ্যাল করিয়া ঘরের চারি দিকে চাহিল। নিরাশ হইয়া আবার দেয়ালের দিকে মুখ করিয়া পাশ ফিরিয়া শুইল।

বিশ্বম্ভরবাবু তাহার মনের ভাব বুঝিয়া তাহার কানে কাছে মুখ নত করিয়া মৃদুস্বরে কহিলেন, 'ফটিক, তোর মাকে আনতে পাঠিয়েছি।'

তাহার পরদিনও কাটিয়া গেলো। ডাক্তার চিন্তিত বিমর্ষ মুখে জানাইলেন, অবস্থা বড়োই খারপ।

বিশ্বম্ভরবাবু স্তিমিতপ্রদীপে রোগশয্যায় বসিয়া প্রতিমুহূর্তেই ফটিকের মাতার জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

টিপ্পনী

টিপ্পনী

ফটিক খালাসিদের মতো সুর করিয়া বলিতে লাগিল, 'এক বাঁও মেলে না। দো বাঁও মেলে -এ -এ - না।' কলিকাতায় আসিবার সময় কতকটা রাস্তা স্টীমারে আসিতে হইয়াছিল, খালাসির কাছি ফেলিয়া সুর করিয়া জল মাপিত ; ফটিক প্রলাপে তাহাদেরই অনুকরণে করুণস্বরে জল মাপিতেছে এবং যে অকূল সমুদ্রে যাত্রা করিতেছে, বালক রশি ফেলিয়া কোথাও তাহার তল পাইতেছে না।

এমন সময়ে ফটিকের মাতা জড়ের মতো ঘরে প্রবেশ করিয়াই উচ্চকলরবে শোক করিতে লাগিলেন। বিশ্বম্ভর বহুকষ্টে তাঁহার শোকোচ্ছাস নিবৃত করিলে, তিনি শয্যার উপর আছাড় খাইয়া পড়িয়া উচ্চৈস্বরে ডাকিলেন, 'ফটিক, সোনা, মানিক আমার।'

ফটিক যেন অতি সহজেই তাহার উত্তর দিয়া কহিল, 'অ্যাঁ।'

মা আবার ডাকিলেন, 'ওরে ফটিক, বাপধন রে।'

ফটিক আস্তে পাশ ফিরিয়া কাহাকেও লক্ষ্য না করিয়া মৃদুস্বরে কহিল, 'মা, এখন আমার ছুটি হয়েছে মা, এখন আমি বাড়ি যাচ্ছি।'

পাঠ পর্যালোচনা

রবিন্দ্রনাথ বিরচিত ছুটি গল্পটি ১২৯৯ সালের পৌষমাসে লেখা এবং সাধনা পত্রিকায় প্রকাশিত। পরে বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগের গল্পগুচ্ছের প্রথমখন্ডে সংকলিত হয়েছে। প্রকৃতি ও মানবজীবনের চিরন্তন অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের বিশ্বজনীন আবেদন - 'মা এখন আমার ছুটি হয়েছে মা, এখন আমি বাড়ি যাচ্ছি।' আমাদের হৃদয় ভিত অশ্রুসিক্ত করে। গ্রাম্য বিস্তৃত উদার প্রান্তরে ছোট একটি ঘটনা রবীন্দ্র দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে, তা তাঁর গল্পের বিষয় হয়ে উঠেছে। ছোটগল্প যে কত আবেদনশীল হতে পারে ছুটি গল্পটি তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

পাড়া গাঁয়ের দুরন্ত এক বালকের কাহিনী নিয়ে গড়ে তুলেছেন ছুটি গল্পটি সেই দুরন্ত বালক ফটিক চক্রবর্তী। বালকদের দলের নেতা সে, তার কথাতেই নতুন নতুন খেলা শুরু হয়। একদিন নদীর ধারে খেলা করার সময় মাথায় নতুন ভাবোদয় হয় যে চরে প্রকান্ড শাল কাঠেকে সবাই মিলে গড়িয়ে নিয়ে যাবে। এই বিশালাকার শালকাঠ দূরে ফেলে দিলে যার কাঠ তার যে অসুবিধা আবশ্যক তা বুঝেই ফটিকের নির্দেশে সবাই একমত হয়ে কাজে রূপান্তরিত করার চেষ্টায় চলেছে। কিন্তু এই খেলায় বাধ সাধল ফটিকের ভাই মাখনলাল। মাখনলাল গুঁড়িটির ওপরে বসে পড়ল ফটিক এসে ভাইকে 'দেখ, মারখাবি। এইবেলা ওঠ।' বলে শাসালে ও ভয় না পেয়ে নড়ে চড়ে বসে পড়ল। ফটিক ভাইকে মেরে নামিয়ে দিতে পারত কিন্তু পাছে মায়ের

ভয়ে তা করতে পারেনি তাই এই বালকে মাথায় মুহূর্তে এক নতুন খেলার উদয় হ। মাখন সুদ্ধু গুড়িটিকে গড়িয়ে দেবে, এতে বিপদ ঘটতে পারে তা তাদের মনে আসেনি। দুরন্ত বালক মনে এসকল অগ্রপশ্চাৎ ভাবনা দেখা যায় না। কাজে ঝাঁপিয়ে পড়াই তাদের ধর্ম। সকলে মিলে এক ঠেলা দিতেই মাখন ভূমিশয্যা গ্রহণ করল। এতে সবাই আনন্দ লাভ করলেও ফটিক মাখনের বিষয়ে সচেতন ছিল। মাখন উঠে -

'ফটিকের উপরে গিয়া পড়িল, একেবারে অন্ধভাবে মারিতে লাগিল। তাহার নাকে মুখে আচড় কাটিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে গৃহাভিমুখে গমন করিল। খেলা ভাঙিয়া গেল।'

বিপদের আশঙ্কা না করেই বালক মনের এক অসাবিল আনন্দের প্রকাশ এই খেলা।

ফটিক ও মাখন এই দুই ভাইয়ের কথা আমরা ছিন্ন পত্র পেয়েছি। ছিন্ন পত্রাবলীতে, জমিদারি সূরে শিলাইদহে বসবাস, জীবন ও প্রকৃতির সৌন্দর্য নিবিড়ভাবে উপলব্ধি করেছিলেন এখান থেকে তার জীবনের বহু ছোটগল্পের মধ্যে নদীচর গ্রাম জনজীবন আজো বেঁচে আছে ছুটি গল্প তার প্রমাণ। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্রজীবনী' তে সেকথাই পাচ্ছি -

"নির্জন চরের মধ্যে নৌকাবাস কালে প্রকৃতিকে অন্তর দিয়া দেখিবার ও জমিদারির দৈনিন্দিন কাজের ভিতর দিয়া মানুষকে গভীরভাবে বুঝিবার যে অবসর লাভ করেন তাহা জীবনে বা সাহিত্য ব্যর্থ হয় নাই। দৃশ্যমান জগতে ক্ষুদ্র ঘটনারাজি একজন স্পর্শচেতক কবির চিত্তমাঝে কতোভাবে ছায়া ও মায়া সৃষ্টি করিতে পারে তাহা 'ছিন্নপত্র' পড়িলেই জানা যায়, ... এই নদীপথের ও গ্রাম্য সংসারের বহুদশ্য ও ঘটনা 'সাধনার যুগে গলামধ্যে রূপ লইয়াছিল।"

গ্রাম্য বালকদের নৌকার গলুইয়ে চড়া, কাশের গোড়া চিবিয়ে রস খাওয়া, দূর নৌকার মাঝির মাল্লাদের গান, ঘুড়ি ওড়ানো, ছুটি গল্পো স্থান পেল।

পাঠে অমনোযোগী অবাধ্য ফটিকের শহর যাত্রার ব্যবস্থা হল মামা বিশ্বম্ভর বাবুর আগমনে, মামা বিশ্বম্ভর বাবু বাড়িতে এসে ফটিকের চাল চলন পর্যবেক্ষন করে বুঝেছে যে খুব দুরন্ত, তার মাকে ও খুব জ্বালাতন করে তাই কলকাতা নিয়ে গিয়ে পাঠে মননিবেশ করানোর জন্য সিদ্ধন্ত নিয়েছে। বিশ্বম্ভর বাবু তার বোনের কাচে দুই সন্তানের পড়াশুনা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে দুই বিপরীত ধর্মী চরিত্রের কথা উঠে আসে। মাখন যতটাই বিদ্যানুরাগী শান্ত ফটিক ততটাই চঞ্চল - অমনোযোগী, ফটিক সম্বন্ধে তার মায়ের কথা -

'ফটিক আমার হা জ্বালাতন করিয়াছে।'

সন্তান মায়ের কাছে স্নেহের আদরের কিন্তু দুরন্ত ফটিকের জন্য তার মায়ের চিন্তার শষ নেই।

টিপ্পনী

তার মায়ের আশংখা মাখনকে যে কখন জলে ফেলে দেয় বা মাথা ফাটিয়ে দেয়। এই ভয় থেকে রেহাই পেতে পিতৃহীন পুত্রকে দাদার সঙ্গে কলকাতায় মানুষ হওয়ার কথা শুনে রাজী হয়ে যায়। ফটিকও যে মনে মনে শহরে যাওয়ার লোভ ছিল তা মায়ের প্রশ্নের উত্তরে জবাব দেয় । মা ফটিককে বলে -'কেমন রে ফটিক, মামার সঙ্গে কলকাতায় যাবি?'

ফটিক লাফাইয়া উঠিয়া বলিল, 'যাব'।

সকল কিছুতেই যেন তার আগ্রহের শেষ নেই, এই বাল্যবয়স সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য :

'শৈশব এবং যৌবনের অনেক দোষ মাপ করা যায়, কিন্তু এই তের চোদ্দ বছর বয়সী ফটিক যেন সবার কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছে । মামার বাড়ীতে এসে পাড়াগাঁয়ের ফটিক কোনকিছুতেই যেন মন বসাতে পারে না' -

'সেও সর্বদা মনে মনে বুঝিতে পারে। পৃথিবীর কোথাও সে ঠিক খাপ খাইতেছে না;

নিজের মামী বা অন্যদের কাছ থেকে কোন সহানুভূতি বা সখ্য লাভ করতে পারেনি। এমন অবস্থা সম্পককর্কে গল্পকার লিখলেন -

'সুতরাং তাহার চেহারা এবং ভাবখানা অনেকটা প্রভুহীন পথের কুকুরের মতো হইয়া যায়।'

এই বয়সের বালকের কাছে মাতৃভবনই স্নেহের স্থান অন্যস্থান 'বালকের পক্ষে স্থান অন্যস্থান 'বালকের পক্ষে নরক।'

কিছুদিনের মধ্যে শহর জীবন কীটের জীবনের ন্যায় মনে হয়েছে । মামার বাড়ীর অনাদর ও বদ্ধজীবন সহ্যহীন হয়ে পড়ে। তাই ফেলে আসা গ্রামজীবনের কথা মনে উদ্ভাসিত হয়।

'প্রকান্ড একটা ধাউস ঘুড়ি লইয়া বোঁ বোঁ শব্দে উড়াইয়া বেড়াইবার সেই মাঠে, 'তাইরে নাইরে না' করিয়া উচ্চঃস্বরে স্রচিত রাগিনী আলাপ করিয়া অকর্মন্যভারে ঘুরিয়া বেড়াবার সেই নদীতীরে, দিনের মধ্যে যখন-তখন ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া সাঁতার কাটিবার সেই সংকীর্ন শ্রোতস্বিনী, সেই দলবল, উপদ্রব স্বাধীনতা এবং সর্বোপরি সেই অত্যাচারিনী অবিচারিনী মা অহর্নিশি তাহার নিরুপায় চিত্তকে আকষর্ণ করিত।'

স্কুলের পাঠে তার মন বসেনা সকল সময় মায়ের চিন্তা। বাড়ি ফেরার চিন্তা তাকে তাড়িয়ে বেড়াত। মামার কাছেই তার একটু স্নেহ-আবদার ছিল তাই মামার কাচে করুণ আবেদ -

‘মামা, মার কাছে কবে যাব ?’ মামাই তাকে বলেছিল ‘স্কুলে ছুটি হোক’ তবে যাওয়া হবে।

এরপর নানান ঘটনা তাকে অতিষ্ট করে তুলল করে তার আর একমুউর্ত এখানে ভালো লাগে না। মুক্তজীবন ছেড়ে অপরাধীর জীবন যাপনে হাঁপিয়ে ওঠে। একদিন না বলে মামার বাড়ি ত্যাগ করে মায়ের কাছে যাওয়ার জন্য জ্বর শরীরে রওনা দেয়। অনেক খোঁজাখুঁজির পর পুলিশ তাকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে। সমস্ত শরীরে জলে - কাদায় মাখামাখি, এমন অবস্থা দেখে বিশ্বম্ভরবাবু কোলে করে গৃহ অভান্তরে নিয়ে আসে। শরীরে এখন জ্বরের মাত্রা বেড়ে চলেছে ফটিক আপন মনে বলে ‘মামা, আমার ছুটি হয়েছে কী ? একথা শুনে মামার চোখে অশ্রুরোধ হয় না , স্বস্নেহে মামা ফটিকের -

‘শীর্ন তপ্ত হাতখানি হাতের উপর তুলিয়া লইয়া তাহার কাছে আসিয়া বসিলেন।’

ফটিকের মার কাছে সংবাদ পাঠানো হয়েছে । এদিকে দাক্তার নিদান দিল তার অবস্থা সংকটজনক।

ফটিক প্রাণ চঞ্চল আনন্দের প্রতিমূর্তি, তাকে শহরের রূদ্ধদ্বারে রাখাতো প্রাণহীনতার নামান্তর। অসীম অনন্তের আবেদন তার হৃদয়ের মধ্যে, প্রকতির সঙ্গে তার নাড়ীর সংযোগ, তাই জ্বরের মধ্যেও -

‘ফটিক খালাসিদের মতো সুর করিয়া বলিতে লাগিল ‘এক বাঁও মেলে না। দো বাঁও মেলে -এ -এ - না।’

অসীম অকূল সমুদ্রে স্টীমার যাত্রার ও নোঙর করার সেই তল না পাওয়ার সুর ফটিকে মুখে। ফটিকের সেই অচীন পাখি পাখা মেলার অপেক্ষায়। মায়ের জন্যই তার এই দীর্ঘসূত্রতা। এ মায়াই তাকে দে্ থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় নি। মা উচ্চকলরবে ফটিকে শয্যার উপর পড়ে - ‘ফটিক, সোনা, মানিক আমার।’ বলে ড়াকতে লাগল’ মা আকুল হয়ে সেই দুরন্ত ফটিক শেষের দিনে বললে -

‘ওরে ফটিক ; বাপাধন রে।’

সুদূরের ডাক এসেছে ফটিকের আর ফিরে তাকাবার সময় নেই তাই পাশ ফিরে লক্ষ্য না করে মৃদুস্বরে বলল -

‘মা, এখন আমার ছুটি হয়েছে মা, এখন আমি বাড়ি যাচ্ছি।’

টিপ্পনী

আমাদের প্রিয় ফটিক ভববন্ধন ত্যাগ করে অনন্ত লোকের পথে যাত্রা করল। আমাদের হৃদয় শোকসাগরে নিয়জ্জিত হয়। তার যাত্রা সমগ্র বিশ্বে মাতা -ও সন্তানের ইচ্ছেদ হয়ে দাঁড়ায়। রবীন্দ্র ছোটগল্প বিশ্বজনীন আবেদনে পূর্ন তা প্রমাণ করে 'ছুটি' গল্প।

'ছুটি' গল্প আলোচনার ক্ষেত্রে মামা বিশ্বম্ভরবাবুর কথা না বললে অবিচার করা হয়। স্বামীহীন বোনের সন্তানকে স্নেহের বসে মানুষ করার জন্য কলকাতা শহরে নিয়ে এসেছে। তবে বিশ্বম্ভর বাবুর স্ত্রীর তা পচ্ছন্দের নয়। রবীন্দ্রনাথ এ সম্পর্কে বললেন -

'মামী এই অনাবশ্যক পরিবার বৃদ্ধিতে মনে মনে যে বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, তাহা বলিতে পারি না।'

তিন সন্তান নিয়ে এমনিতেই অতিষ্ট তার উপর ফটিক ঝামেলা তার কাছে বোঝা স্বরূপ। মামীর কাজ উৎসাহের সঙ্গে করে দিলেও মন পাওয়া যায়নি। শুধুমাত্র মামার কাছেই তার আবদার তাই শহর জীবন শ্বাসরূদ্ধ অবস্থা ধারন করলে ফটিক মামাকে বলে -

'মামা, মার কাচে কবে যাব।'

মামাতো ভাইদের সঙ্গে ও ফটিক সখ্যতা গড়ে ওঠেনি। মামার বাড়ির পয়সা নষ্ট করে এবং বোঝা হয়ে তার থাকার ইচ্ছা নেই তাই গৃহত্যাগ। প্রিয় মামা সন্তান স্নেহে ফটিককে ভালোবাসে। তাই জ্বর অবস্থায় তাকে যকন উদ্ধার করা হয় তখন তার মামাই কোলে করে গৃহে নিয়েছে। প্রবল জ্বরে মামাকেই তার মায়ের কথা জিজ্ঞাসা করেছে। প্রিয় ভাগ্নের মরণ শিয়রে দাড়িয়ে মামা অশ্রুমোচন করে - মাকে নিয়ে আসার জন্য লোক পাঠানো হয়েছে বলে জানান। ফটিকের অন্তিম মুহুর্ত পর্যন্ত মামা তার পাশে থেকেছে। ছোট ফটিকে চলে যাওয়া সে মানতে পারেনি।

বিশ্ব ছোট গল্পের ইতিহাসে 'ছুটি' অনন্য শ্রেণীভুক্ত। কি বিষয়, ভাষা আবেগ সকল দিক দিয়ে নিখিল মানব মনে চিরন্তন আবেদন রেখে গেছে। রবীন্দ্রনাথ কতবড় গল্পকার, জীবনের চিত্রকর তার স্বাক্ষর তাঁর ছোটগল্প।

আদর্শ প্রশ্নমালা :

ক. 'ছুটি' গল্প অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি ভাবনার পরিচয় দাও।
খ. 'ছুটি' গল্পের নামকরনে র সার্থকতা বিচার করো।
গ. 'ছুটি গল্পে ফটিকের জীবনের মর্মান্তিক পরিনিতি অন্তিমে করুন রস উদ্রেক করেছে - আলোচনা কর।

ঘ. ফটিক আমার হাড় জ্বালাতন করিয়াছে।'- বক্তা কে? কার সম্পর্কে এরকম মন্তব্য করেছেন? প্রসঙ্গ আলোচনা কর।

ঙ. 'ঢের হয়েছে, ঢের হয়েছে। ওতে আর তোমায় হাত দিতে হে না।' - কার উক্তি ? কাকেউদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে? বক্তার চরিত্র আলোচনা কর।

চ. 'বেশ করেছ, আমি তোমাকে মাসের মধ্যে পাঁচবার করে বই কিনে দিতে পারিনে।' - কে কাকে উদ্দেশ্য করে এ কথা গুলি বলেছেন / এমন কথা বলার কারন কি?

ছ. আমি মার কাছে যাচ্ছিলুম, আমাকে ফিরিয়ে এনেছে।' - কোন প্রসঙ্গে কে , কাকে একথা বলেছে? আলোচনা কর।

জ. 'স্তিমিত প্রদীপে রোগশয্যায় বসিয়া প্রতিমুহূর্তেই ফটিকের মাতার জন্য প্রতিক্ষা করিতে লাগিলেন।' - কে অপেক্ষা করে আছেন? বক্তার চরিত্র পরিস্ফুট কর।

ঝ. 'মা, এখন আমার ছুটি হয়েছে মা, এখন আমি বাড়ি যাচ্ছি।' - কার উক্তি ? তার চরিত্রালোচনা কর।

ঞ. 'ছুটি' গল্প অবলম্বনে নমমানব জীবন ও প্রকৃতির যে অবিচ্ছেদ্য বন্ধন বর্তমান তা আলোচনা কর।

টিপ্পনী

টিপ্পনী

দানপ্রতিদান

টিপ্পনী

বড়োগিন্নি যে কথাগুলে বলিয়া গেলেন, তাহার ধার যেমন তাহার বিষও তেমনি। যে হতভাগিনীর উপর প্রয়োগ করিয়া গেলেন, তাহার চিত্তপুত্তলি একেবার জ্বলিয়া জ্বলিয়া লুটিতে লাগিল।

বিশেষত, কথাগুলা তাহার স্বামীর উপর লক্ষ্য করিয়াবলা - এবং স্বামী রাধামুকুন্দ তখন রাত্রের আহার সমাপন করিয়া অনতিদূরে বসিয়া তাম্বুলের সহিত তাম্রকূটধূম্র সংযোগ করিয়া খাদ্যপরিপাকে প্রবৃত্ত ছিলেন। কথাগুলো শ্রুতিপথে প্রবেশ করিয়া তাঁহার পরিপাকের যে বিশেষ ব্যাঘাত করিল, এমন বোধ হইল না। অবচলিত গাম্ভীর্যের সহিত তাম্রকূট নিঃশেষ করিয়া অভ্যাসমত যথাকালে শয়ন করিতে গেলেন।

কিন্তু এরূপ অসামান্য পরিপাকশক্তি সকললের নিকটে প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না। রাসমনি আজ শয়নগৃহে আসিয়া স্বামির সহিত এমন ব্যবহার করিল, যাহা ইতিপূর্বে সে কখনো করিতে সাহস করে নাই। অন্যদিন শান্তভাবে শয্যায় প্রবেশ করিয়া নীরবে সে কখনো কলরিতে সাহস করে নাই। অন্যদিন শান্তভাবে শয্যায় প্রবেশ করিয়া নীরবে স্বামীর পদসেবায় নিযুক্ত হইত, আজ একেবারে সবেগে কঙ্কনঝংকার করিয়া স্বামীর প্রতি বিমুখ হইয়া বিছানার একপাশে শুইয়া পড়িল এবং ক্রন্দনাবেগে শয্যাতল কম্পিত করিয়া তুলিল।

রাধামুকুন্দ তৎপতি মনোযোগ না দিয়া একটা প্রকান্মড পাশবালিশ আঁকড়িয়া ধরিয়া নিদ্রার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার এই ঔদাসীন্যে স্ত্রীর অধৈর্য্য উত্তরোত্তর বাড়িয়া উঠিতেছে দেখিয়া অবশেষে মৃদুগম্ভীর স্বরে জানাইলেন যে, তাঁহাকে বিশেষ কাযর্যবশত ভোরে উঠিতে হউইবে, এক্ষনে নিদ্রা আবশ্যক।

স্বামীর কণ্ঠস্বরে রাসমণির ক্রন্দন আর বাধা মানিল না, মূউর্তে উদ্‌বেলিত হইয়া উঠিল।

রাধামুকুন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কী হইয়াছে?'

রাসমনি উচ্ছসিত স্বরা কহিলেন, 'শোন নাই কি?

'শুনিয়াছি। কিন্তু বউঠাকরুন একটা কথাও তো মিথ্যা বলেন নাই। আমি কি দাদার অন্নেই প্ররতিপালিত নহি? তোমার কাপড় চোপড় গহনাপত্র এ-সমস্ত আমি কি আমার বাপের কড়ি হইতে আনিয়া দিয়াছি? যে খাইতে পরিতে দেয় সে যদি দুটো কথা বলে, তাও খাওয়াপরার শালমিল করিয়া লইতে হয়।

টিপ্পনী

‘এমন খাওয়াপরায় কাজ কী?’

‘বাঁচিতে তো হইবে।’

‘মরণ হইলেই ভালো হয়।’

‘যতক্ষন না হয় ততক্ষন একটু ঘুমাইবার চেষ্টা করো , আরাম বোধ করিবে।’ বলিয়া রাধামুকুন্দ উপদেশ ও দৃষ্টান্তের সামঞ্জস্যসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন।

রাধামুকুন্দ ও শশীভূষন সহোদর ভাই নহে, নিতান্ত নিকট-সম্পর্কও নয় ; প্রায় গ্রামসম্পর্ক বলিলেই হয় ল কিন্তু প্রীতিবন্ধন সহোদর ভাইয়ের চেয়ে কম কিছু নহে। বড়োগিন্নি ব্রজসুন্দরীর সেটা কিছু অসহ্য বোধ হইত । বিশেষত, শশীভূষণ দেওয়াথোওয়া সম্বন্ধে ছোটোবউয়ের অপেক্ষা নিজ স্ত্রীর প্রতি অধিক পক্ষপাত করিতেন না বরঞ্চ যে-জিনিসটা নিতান্ত একজোড়া না মিলিত, সেটা ঘৃহিণীকে বঞ্চিত করিয়া ছোটবউকে দিতেন। তাহা ছাড়া, অনেক সময়া তিনি স্ত্রীর অনুরোধ অপেক্ষা রাধামুকুন্দের পরামর্শের প্রতি বেশি নির্ভর করিতেন, তাহার পরিচয় পাওয়া যায় । শশিভূষণ লোকটা নিতান্ত ঢিলাঢালা রকমের, তাই ঘরের কাজ ও বিষয়কর্মের সমস্ত ভার রাধামুকুন্দের উপরেই ছিল। বড়োগিন্নির সর্বদাই সন্দেহ, রাধামুকুন্দ তলে তলে তাঁহার স্বামীকে বঞ্চনা করিবার আয়োজন করিতেছে - তাহার যতই প্রমাণ পাওয়া যাইত না, রাথার প্রতি তাঁহার বিদ্বেষ ততই বাড়িয়া উঠিত। মনে করিতেন, প্রমাণগুলোও অন্যায় করিআ তাঁহার বিরুদ্ধজরূপপক্ষ অবলম্বন করিয়াছে, এইজন্য তিনি আবার প্রমাণের উপর রাগ করিয়া তাহাদের প্রতি নিরতিশয় অবজ্ঞা প্রকাশপূর্বক নিজের সন্দেহকে ঘরা বসিয়া দ্বিগুন দৃঢ় করিতেন । তাঁহার এই বহুযত্নপোষিত মানসিক আগুন আগ্নেয়গিরির অগ্নুযৎপাতের ন্যায় ভূমিকম্প সহকারে প্রায় মাঝে মাঝে উষ্ণভাষায় উচ্ছিসত হইত।

রাত্রে রাধামুকুন্দের ঘুমের ব্যাঘাত হইয়াছিল কি না বলিইতে পারি না - কিন্তু পরদিন সকালে উঠিয়া তিনি বিরসমুখে শশিভূষনের নিকট গিয়া দাঁড়াইলেন । শশিভূষন ব্যস্তসমস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘রাধে, তোমায় এমন দেখিতেছি কেন? অসুখ হয় নাই তো?’

রাধামুকুন্দ মৃদুস্বরে ধীরে ধীরে কহিলেন, ‘দাদা, আর তো তোমার এখানে থাকা হয় না ।’ এই বলিয়া গত সন্ধ্যাকালে বড়োগৃহিণীর আক্রমণবৃত্তান্ত সংক্ষেপে এবং শান্তভাবে বর্ণনা করিয়া গেলেন।

শশোভূষন হাসিয়া কহিলেন, ‘এই । এ তো নূতন কথা নহে । ও তো পরের ঘরের মেয়ে, সুযোগ পাইলেই দুটো কথা বলিবে, তাই বলিয়া ঘরের লোককে ছাড়িয়া যাইতে হইবে! কথা আমাকেও তো মাঝে মাঝে শিনিতে হয়, তাই বলিয়া তো সংসার ত্যাগ করিতে পারি না।

রাধা কহিলেন, 'মেয়েমানুষের কথা কি আর সহিইতে পারি না ; তবে পুরুষ হইয়া জন্মিলাম কী করিতে ! কেবল তোমার সংসারে পাচ্ছে অশান্তি ঘটে।'

শশিভূসন কহিলেন, 'তুমি গেলে আমার কিসের শান্তি।'

আর অধিক কথা হইল না। রাধামুকুন্দ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া চলিয়া গেলেন, তাঁহার হৃদয়ভার সমান রহিল।

এদিকে বড়োগৃহিণীর আক্রোশ ক্রমশই বাড়িয়া উঠিতেছে। সহস্র উপলক্ষে যখন তখন তিনি রাধাকে খোঁটা দিতে পারিলে ছাড়েন না ; মুহুর্মুহু বাক্যবাণে রাসমনির অন্তরত্মাকে একপ্রকার শরশয্যাশায়ী করিয়া তুলিলেন। রাধা যদিও চুপচাপ করিয়া তামাক টানেন এবং স্ত্রীকে ক্রন্দনোন্মুখী দেখিবামাত্র চোখ বুজিয়া নাক ডাকাইতে আরম্ভ করেন, তবু ভাবে বোধ হয় তাঁহারও অসহ্য হইয়া আসিয়াছে।

কিন্তু শশিভূষণের সহিত তাঁহার সম্পর্ক তো আজিকার নহে - দুই ভাই যখন প্রাতঃকালে পান্তাভাত খাইয়া পাতপাড়ি কক্ষে একসঙ্গে পাঠশালায় যাইত, উভয়ে যখন এসঙ্গে পরামর্শ করিয়া গুরুমহাশয়কে ফাঁকি দিয়া পাঠশালা হইতে পালাইয়া রাখাল ছেলেদের সঙ্গে মিশিয়া নানাবিধ খেলা ফাঁদিত, এক বিছানায় শুইয়া স্তিমিত আলোক মাসির নিকট গল্প শুনিত, ঘরের লোককে লুকাইয়া রাত্রে দূর পল্লীতে যাত্রা শুনিতে যাইত এবং প্রাতঃকালে ধরা পড়িয়া অপরাধ এবং শাস্তি উভয়ে সমান ভাগ করিয়া লইত - তখন কোথায় ছিল ব্রজসুন্দরী, কোথায় ছিল রাসমণি ! জীবনের এতগুলো দিনকে কি একদিনে বিচ্ছিন্ন করিয়া চলিয়া যাওয়া যায় ? কিন্তু এই বন্ধন যে স্বার্থপরতার বন্ধন, এই প্রগাঢ় প্রীতি যে পরান্নপ্রত্যাশার সুচতুর ছদ্মবেশ, এরূপ সন্দেহ এরূপ আভাসমাত্র তাঁহার নিকট বিষতুল্য বোধ হইত, অতএব আর কিছুদিন এরূপ চলিলে কী হইত বলা যায় না। কিন্তু এমন সময়ে একটা গুরুতর ঘটনা ঘটিল।

যে-সময়ের কথা বলিতেছি তখন নির্দিষ্ট দিনে সূর্যাস্তের মধ্যে গর্বর্মেন্টের খাজনা শোধ না করিলে জমিদারি সম্পত্তি নিলাম হইয়া যাইত।

একদিন খবর আসিল, শশিভূষনের আকমাত্র জমিদারি পরগনা এনাৎশাহী লাটের খাজনায় নিলাম হইয়া গেছে।

রাধামুকুন্দ তাঁহার স্বাভাবিক মৃদু প্রশান্তভাবে কহিলেন, 'আমারই দোষ।'

শশিভূষন কহিলেন, 'তোমার কিসের দোষ। তুমি তো খাজনা চালান দিয়াছিলে, পথে যদি ডাকাত পড়িয়া লুটিয়া লয়, তুমি তাহার কী করিতে পার।'

টিপ্পনী

টিপ্পনী

দোষ কাআর এক্ষনে তাহা স্থির করিতে বসিয়া কোনো ফল নাই - এখন সংসার চালাইতে হইবে। শশিভূষন হঠাৎ যে কোনো কাজকর্মে হাত দিবে, সেরূপ তাঁহার স্বভাব ও শিক্ষা নহে। তিনি যেন ঘাটের বাঁধা সোপান হইতে পিছলিয়া একমুহূর্তে ডুবজলে গিয়া পড়িলেন ।

প্রথমেই তিনি স্ত্রীর গহনা বন্ধক দিতে উদ্যাত হইলেন। রাধামুকুন্দ একথলে টাকা সম্মুখে ফেলিয়া তাহাতে বাধা দিলেন। তিনি পূর্বই নিজ স্ত্রীর গহনা বন্ধক রাখিয়া যথোপযুক্ত অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

সংসরে একটা মহৎ পরিবতফন দেখা গেল, সম্পৎকালে গৃহিণী যাহাকে দূর করিবার সহস্র চেষ্টা করিয়াছিলে, বিপৎকালে তাহাকে ব্যাকুলভাবে অবলম্ব করিয়া ধরিলেন। এই সময়ে দুই ভ্রাতার মধ্যে কাহার উপরে অধিক নির্ভর করা যাইতে পারে, তাহা বুঝিয়া লইতে তাঁহার বিলম্ব হইল না। কখনো যে রাধামুকুন্দের প্রতি তাঁহার তিলমাত্র বিদ্বেষভাব ছিল, এখন আর তাহা প্রকাশ পায় না।

রাধামুকুন্দ পূর্ব হইতেই স্বাধীন উপার্জনের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল। নিকটবর্তী শহরে সে মোক্তারি আরম্ভ করিয়া দিল। তখন মোক্তারি ব্যবসায়ে আয়ের পথ এখনকার অপেক্ষা বিস্তৃত ছিল এবং তীক্ষণবুদ্ধি সাবধানী প্রথম হইতেই পসার জমাইয়া তুলিল। ক্রমে সে জিলার অধিকাংশ বড়ো বড়ো জমিদারের কার্যভার গ্রহণ করিল।

এক্ষনে রাসমণির অবস্থা পূর্বের ঠিক বিপরীত। এখন রাসমণির স্বামীর অন্নেই শশিভূষণ এবং ব্রজসুন্দর প্রতিপালিত। সে কথা লইয়া সে স্পষ্ট কোনো গর্ব করিয়াছিল কি না জানি না, কিন্তু কোনো একদিন বোধ করি আভাসে ইঙ্গিতে ব্যবহারে সেই ভাব ব্যক্ত করিয়াছিল, বোধ করি দেমাকের সহিত পা ফেলিয়া এবং হাত দুলাইয়া কোনো একটা বিষয়ে বড়োগিন্নির ইচ্ছার প্রতিকূলে নিজের মনোমত কাজ করিয়াছিলো - কিন্তু সে কেবল একটিদিন মাত্র - তাহার পরদিন হইতে সে যেন পূর্বের অপেক্ষাও নম্র হইয়া গেল। কারণ, কথাটা তাহার স্বামীর কানে গিয়াছিল, এবং রাত্রে রাধামুকুন্দ কী কী যুক্তি প্রয়োগ করিয়াছিল ঠিক বলিতে পারি না, পরদিন হইতে তাহার মুখে আর 'রা' রহিল না, বড়োগিন্নির দাসীর মতো হইয়া রহিল - শুনা যায়, রাধামুকুন্দ সেই রাত্রেই স্ত্রীকে তাহার পিতৃভবনে পাঠাইবার উদ্যোগ করিয়াছিল এবং সপ্তাহকাল তার মুখদর্শন করে নাই - অবশেষে ব্রজসুন্দরী ঠাকুরপোর হাতে ধরিয়া অনেক মিনতি করিয়া দম্পতির মিলনসাধন করাইয়া দেন, এবং বলেন, 'ছোটোবউ তো সেদিন আসিয়াছে, আর আমি কতকাল হইতে তোমাদের ঘরে আচি, ভাই। তোমাতে আমাতে যে চিরকালের প্রিয়সম্পর্ক তাহার মর্যাদা ও কি বুঝিতে শিখিয়াছে! ও ছেলেমানুষ, উহাকে মাপ করো।'

রাধামুকুন্দ সংসারখরচের সমস্ত টাকা ব্রজসুন্দরীর হাতে আনিয়া দিতেন। রাসমণি নিজের আবশ্যক ব্যয় নিয়ম-অনুসারে অথবা প্রার্থনা করিয়া ব্রজসুন্দরীর নিকট হইতে পাইতেন। গৃহমধ্যে বড়োগিন্নির অবস্থা পূর্বাপেক্ষা ভালো বৈ মন্দ নহে, কারণ পূর্বেই বলিয়াছি শশিভূষণ স্নেহবশে এবং নানা বিবেচনায় রাসমণিকে বরঞ্চ অনেকসময় অধিক পক্ষপাত দেখাইতেন।

শশিভূষণের মুখে যদিও তাঁহার সহজ প্রফুল্ল হাস্যের বিরাম ছিল না, কিন্তু গোপন অসুখে তিনি প্রতিদিন কৃশ হইয়া যাইতেছিলেন। আর কেহ তাহা ততটা লক্ষভ করে নাই, কেবল দাদার মুখ দেখিয়া রাধার চক্ষে নিদ্রা ছিল না। অনেকসময় গভীর রাত্রে রাসমণি জাগ্রত হইয়া দেখিত, গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া অশান্তভাবে রাধা এপাশ ওপাশ করিতেছে।

রাধামুকুন্দ অনেকসময় শশিভূষনকে গিয়া আশ্বাস দিত, 'তোমার কোনো ভাবনা নাই, দাদ। তোমার পৈতৃক বিষয় আমি ফিরাইয়া আনিব - কিছুতেই ছাড়িয়া দিব না। বেশিদিন দেরিও নাই।'

বাস্তবিক বেশিদিন দেরিও হইল না। শশিভূষণের সম্পত্তি যে-ব্যাক্তি নিলামে খরিদ করিয়াছিল সে ব্যবসায়ী লোক, জমিদারির কাজে সম্পূর্ন অনভিজ্ঞ। সম্মানের প্রত্যাশায় কিনিয়াছিল, কিন্তু ঘর হইতে সদরখাজনা দিতে হইত - একপয়সা মুনাফা পাইত না। রাধামুকুন্দ বৎসরের মধ্যে দুই-একবার লাঠিয়াল লইয়া লুটপাট করিয়া খাজনা আদায় করিয়া আনিত। প্রজারাও তাহার বাধ্য ছিল। অপেক্ষাকৃত নিম্নজাতীয় ব্যবসাজীবী জমিদারকে তাহার মনে মনে ঘৃণা করিত এবং রাধামুকুন্দের পরামর্শে ও সাহায্যে সর্বপ্রকারেই তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে লাগিল।

অবশেষে সে বেচারা বিস্তর মকদ্দমা করিয়া বারবার অকৃতকার্য হইয়া এই ঝঞ্ঝাট হাত হইতে ঝাড়িয়া ফেলিবার জণ্য উৎসুকক হইয়া উঠিল। সামান্য মূল্যে রাধামুকুন্দ সেই পূর্ব সম্পত্তি পূনর্বার কিনিয়া লইলেন।

লেখাব যত অল্পদিন মনে হইল, আসলে ততটা নয়। ইতিমধ্যে প্রায় দশ বৎসর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। দশ বৎসর পূর্বে শশিভূষণ যৌবনের সর্বপ্রান্তে প্রৌড়বয়সের আরম্ভভাগে ছিলেন, কিন্তু এই আট-দশ বৎসরের মধ্যেই তিনি যেন অন্তররুদ্ধ মানসিক উত্তাপে বাষ্পযানে চড়িয়া একেবারে সবেগে বার্ধক্যের মাঝখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। পৈতৃক সম্পপত্তি যখন ফিরিয়া পাইলেন, তখন কী জানি কেন, আর তেমন প্রফুল্ল হইতে পারিলেন না। বহুদিন অব্যবহারে হৃদয়ের বীণাযন্ত্র বোধ করি বিকল হইয়া গিয়াছে, এখন সহস্রবার তার টানিয়া বাঁধিলেও ঢিলা হইয়া যায় - সে সুর আর কিছুতেই বাহির হয় না।

টিপ্পনী

টিপ্পনী

গ্রামের লোককেরা বিস্তর আনন্দ প্রকাশ করিল। তাহার আকটা ভোজের জন্য শশিভূষণকে গিয়া ধরিল।ক শশিভূষণ রাধামুকুন্দকে জিজ্ঞাসা করিলো, 'কী বল, ভাই।'

রাধামুকুন্দ বলিলেন, 'অবশ্য, শুভদিনে আনন্দ করিতে হইবে বৈকি।'

গ্রামে এমন ভোজ বহুকাল হয় নাই। গ্রামের ছোটোবড়ো সকলেই খাইয়া গেল। ব্রাহ্মণেরা দক্ষিণা এবং দুঃখীকাঙালগন পয়সা ও কাপড় পাইয়া আশীর্বাদ করিয়া চলিয়া গেল।

শীতে আরম্ভে গ্ররামে খন সময়টা খারাপ ছিল, তাহার উপরে শশিভূষন পরিবেশনাদি বিবিধ কার্যে তিন-চারি দিন বিস্তর পরিশ্রম এবং অনিয়ম করিয়াছিলেন, তাঁহার ভগ্ন শরীর আর শহিল না। তিনি একেবারে শয্যাশায়ী হইয়া পড়িলেন। অন্যান্য দুরূহ উপসর্গের সহিত কম্প দিয়া জ্বর আসিল - বৈদ্য মাথা নাড়িয়া কহিল, 'বড়ো শক্ত ব্যাধি।'

রাত্রি দুই-তিন প্রহরের সময় রোগীর গর হইতে সকলকে বাহির করিয়া দিয়া রাধামুকন্দ কহিলেন, 'দাদা, তোমার অবর্তমানে বিষবের অংশ কাকে কিরূপ দিব, সেই উপদেশ দিয়া যাও।'

শশিভূষণ কহিল, 'ভাই, আমার কি আছে যে কাহাকে দিব।'

রাধামুকুন্দ কহিলেন, 'সবই তো তোমার।'

শশিভূষণ উত্তর দিলেন, 'এককালে আমার ছিল, এখন আমার নহে।'

রাধামুকুন্দ অনেকক্ষন চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। বসিয়া বসিয়া শয্যার এক অংশের চাদর দুই হাত দিয়া বারবার সমান করিয়া দিতে লাগিল। শশিভূষণের শ্বাসক্রিআ কষ্টসাধ্য হইয়া উঠিল।

রাধামুকুন্দ তখন শয্যাপ্রান্তে উঠিয়া বসিয়া রোগীর পা-দুটি ধরিয়া কহিল, 'দাদা; আমি যে মহাপাতকের কাজ করিয়াছি, তাআ তোমাকে বলি, আর তো সময় নাই।'

শশিভূষণ কোনো উত্তর করিলেন না - রাধামুকুন্দ বলিয়া গেলেন - সেই স্বাভাবিক শান্তভাব এবং ধীরে ধীরে কথা, কেবল মাঝে মাঝে এক -একটথা দীর্ঘনিশ্বাস উঠিতে লাগিল, 'দাদা, আমার ভালো করিয়া বলিবার ক্ষমতা নাই। মনের যথার্থ যে-ভাব সে অন্তর্যামী জানেন, আর পৃথিবীতে যদি কেহ বুঝিতে পারে তো, হয়তো তুমি পারিবে। বালককাল হইতে তোমাতে আমাতে অন্তরে প্রভেদ ছিল না। কেবল বাহিরে প্রভেদ। কেবল এক প্রভেদ ছিল - তুমি ধনী, আমি দরিদ্র। যখন দেখিলাম সেই সামান্য সূত্রে তোমাতে আমাতে বিচ্ছেদের সম্ভাবনা ক্রমশই

গুরুতর হইয়া উঠিতেছে, তখন আমি সেই প্রভেদ লোপ করিয়াছিলাম। আমিই সদরখাজনা লুট করাইয়া তোমার সম্পত্তি নিলাম করাইয়াছিলাম।'

শশিভূষন তিলমাত্র বিস্ময়ের ভাব প্রকাশ না করিয়া ঈষৎ হাসিয়া মৃদুস্বরে রুদ্ধ উচ্চারণে কহিলেন, 'ভাই, ভালোই করিয়াছিলে। কিন্তু যেজন্য এত করিলে তাহা কি সিদ্ধ হইল । কাছে কি রাখিতে পারিলে। দয়াময় হরি! বলিয়া প্রশান্ত মৃদু হাস্যের উপরে দুই চক্ষু হইতে দুই বিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

রাধামুকুন্দ তাঁহার দুই পায়ের নীচে মাথা রাখিয়া কহিল, 'দাদা, মাপ করিলে তো?

শশিভূষণ তাহাকে কাছে ডাকিয়া তাহার হাত ধরিয়া কহিলেন, 'ভাই, তবে শোনো। এ কথা আমি প্রথম হইতেই জানিতাম । তমি যাহাদের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়াছিলে তাহারাই আমার নিকট প্রকাশ করিয়াছে। আমি তখন হইতে তোমাকে মাপ করিয়াছি।

রাধামুকুন্দ দুই করতলে লজ্জিত মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

অনেকক্ষন পরে কহিল, 'দাদা, মাপ যদি করিয়াছ, তবে তোমার এই সম্পত্তি তুমি গ্রহণ করো। রাগ করিয়া ফিরাইয়া দিয়ো না।'

শশিভূষণ উত্তর দিতে পারিলেন না - তখন তাঁর বাক্‌রোধ হইয়াছে - রাধামুকুন্দের মুখের দিকে অনিমেষে দৃষ্টি স্থাপিত করিয়া একব আর দক্ষিণ হস্ত তুলিলেন । তাহাতে কী বুঝাইল বলিতে পারি না। বোধ করি রাধামুকুন্দ বুঝিয়া থাকিবে।

লেখক পরিচিতি :

কবি, ছোট গল্পকার রবীন্দ্রনাথ, তাঁর রচনার মধ্যে বারবার খতু পরিবর্তন পরিলক্ষিত। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ছোট গল্পকারদের মধ্যে অন্যতম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, তার ছোট গল্পকে আমরা কয়েকটি পর্বে বিভক্ত করতে পারি। প্রথম পর্বের ছোটগল্পে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও প্রেম প্রাধান্য পাচ্ছে , ঠাকুরবাড়ির জমিদারির সূত্রে পদ্মা -শাজাদপুর - পাতিনগর - পাবনা ও কুঠিয়ার বিস্তীর্ন অঞ্চলের সান্নিধ্য পেয়েছিলেন। নগর জীবনের কৃত্রিমতা নয় শান্ত পল্লী বাংলার উদার প্রান্তরই ছিল তাঁর জীবনের লীলাভূমি। পদ্মা যে কবি গল্পকার রবীন্দ্রনাথের কত প্রিয় তা জানালেন একটি লেখায় -

'আমি শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা মানিনি, কতবার সমস্ত বৎসর ধরে পদ্মার আতিথ্য নিয়েছি, বৈশাখের খর রৌদ্রতাপে, শ্রাবনের মূষলধারাবর্ষনে। পরপারে ছিল ছায়াঘন পল্লীর শ্যামশ্রী, এ

টিপ্পনী

টিপ্পনী

পারে ছিল বালুচরের পান্ডুবর্ণ জনহীনতা, মাঝখানে পদ্মার চলমান স্রোতে পটে বুলিয়ে চলেছে দ্যুলোকের শিল্পী প্রহরে প্রহরে নানাবর্ণের আলোছায়ায় তুলি এইখানে নির্জন সজনের নিত্যসংগ্রাম চলেছিল আমার জীবনে।'

রবীন্দরনাথের ছোট গল্প হিতবাদী, সাধনা, ভারতী, সবুজপত্র, প্রভৃতি পত্রিকায় আত্মপ্রকাশ করেছিল।

রবীন্দরনাথের প্রথম গল্প 'ভিখারিণী' ১৮৭৭ খ্রীৎ 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত। এর পরে 'নবজীবন' ও বালক পত্রিকায় ছোটগল্প লিখতে শুরু করেন। কবিগুরু ছোটগল্প গুলি বৈচিত্র্যময় রচনা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তার লেকনি নব নব বিষবভাব ও রস নিষ্পত্তির বিষয় হয়ে উঠেছে।-

তার গল্পগুলিকে নানা শ্রেণীতে বিভক্ত করা যেতে পারে। তবে এই বিভাগ সমালোচকদের নিজের মত করে করেছেন, একক কোন মত দেখা যায় না।

যেমন,- (ক) সমাজসমস্যা মূলক :- যেমন - দেনাপাওনা, বিচারক, রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা, সমস্যাপূরন, ত্যাগ, নষ্টনীড়, স্ত্রীরপত্র, পাত্রপাত্রী প্রভৃতি।

(খ) পারিবারিক বিষয় সংক্রান্ত :- শাস্তি, দর্পহরণ, স্বর্ণমৃগ, কাবুলিওয়ালা, দানপ্রতিদান, ব্যবধান, খাতা, হালদার গোষ্ঠী, দিদি প্রভৃতি।

(গ) প্রকৃতি ও মানবজীবন সংক্রান্ত : - পোষ্টমাস্টার, অতিথি, একরাত্রি, সমাপ্তি, ছুটি, প্রভৃতি।

(ঘ) অতিপ্রাকৃত গল্প :- মণিহার, ক্ষুধিত পাষাণ, দুরাশা, দালিয়া, মহামায়া প্রভৃতি।

(ঙ) রাজনীতি সংক্রান্ত : - মেঘ ও রৌদ্র, দুর্বুদ্ধি, রাজটীকা প্রভৃতি।

(চ) মায়াজাল ও অলৌকিকত্ব সম্পর্কিত :- কঙ্কাল, প্রায়শ্চিত্ত, গুপ্তধন, জীবিতমৃত, প্রভৃতি।

এছাড়া রবীন্দ্র নাথ শেষজীবনের রচনা করলেন 'তিনসঙ্গীর' মত গল্পগ্রন্থ। এখানে রবিবার, শেষকথা ও ল্যাবরেটরির মত আধুনিক মনস্ক ছোটগল্প রচনা করলেন রবীন্দ্রনাথ। এই গল্প গুলিতে ইউরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞান এ সঙ্গে আছে ভারতীয় জীবনের সৌযম্য ও সংযম বোধ। ছোটগল্প রচনায় বিষয় বৈচিত্র যেমন আচে তেমনি লেখনির সবুজ সরল সাবলীল গতি দেখে কবিগুরুর সহজাত প্রতিভার কথা স্মরণ করায়।

পাঠ পর্যালোচনা :

টিপ্পনী

'দানপ্রতিদান' গল্প গুচ্ছের প্রথমখন্ডে সংকলিত হয়েছে। গল্পটি লিখেছেন ১২৯৯ সালে চৈত্র মাসে। প্রকাশিত হয় 'সাধনা' পত্রিকায়।

সমাজ-সংসারের কত বৈচিত্রময় অভিজ্ঞতা তাঁর ঘটে ছিল তা অকথনীয় । 'দানপ্রতিদান' সেই অভিজ্ঞতা লব্ধ জীবনের ফসল । শশিভূষণ, রাধামুকুন্দ, ব্রজসুন্দরি ও রাসমণি চারটি চরিত্র অবলম্বনে ঘটনার সূত্রপাত ও যবনিকা । শশিভূষণ এনাৎশাহি লাটের জমিদরির সত্তাধিকারী ছিলাএন, সত, বন্ধুবৎসল, উদার হাস্যমুখর মানুষটি এই চারজনের সংসারের প্রধান । শশিভূষনের স্ত্রী ব্রজসুন্দরী ছোটদের শ্রদ্ধার জায়গায় থাকলেও তার কথা গুলো যেন - 'তাহার ধার যেমন তাহার বিষও তেমনি।' তিনিই বাড়ির বড়োগিন্নী তার শ্লেষবান সহ্য করতে হয় অন্যদের। শশিভূষণই আয়করে এ সংসার চালিয়ে রেখেছে। রাধামুকুন্দ এবং রাশমণিকে তার সংসার ভাই , ভাই বৌ এর মত স্থান দিয়েছে । কে এই রাধামাধব যে শশীভূষণের সহোদরের স্থান দখল করল। লেখক সে সম্পর্কে জানালেন -

'রাধামুকুন্নদ ও শশিভূষণ সহোদর ভাই নহে, নিতান্ত নিকট সম্পর্কিত ও নয় ; প্রায় গ্রামসম্পর্ক বলিলেই হয়। কিন্তু প্রীতিবন্ধন সহোদর ভাইয়ের চেয়ে কিছু কম নহে।'

এমন সম্পর্ক ও অন্ন অর্থ ধ্বংস বড়োগিন্নীর সহ্য না হওয়াই স্বাভাবিক।

ব্রজসুন্দরী বিষবাক্যবাণে রাসমনি ও রাধামুকুন্দ নিজেদের কে এ সংসারে অনাউত বলে ভাবতে লাগল। বে রাধামুকুন্দ নিজের অক্ষমতা ও দায় অকপটে স্বীকার করে বলেছে -

'কিন্তু বউঠাকুরণ একটা কথাও তো মিথ্যা বলেন নাই । আমি কি দাদার অন্নেই প্রতিপালিত নহি ? তোমার এই কাপড় চোপড়, গহনাপত্র এ সমস্ত আমি কি আমার বাপের কড়ি হইতে আনিয়া দিয়াছি ? যে খাইতে পরিতে দেয় সে যদি দুটো কথা বলে, তাহা ও খাওয়াপরার শামিল করিয়া লইতে হয়।'

জীবনের কত কৈশর-যৌবনের দিন শশিভূষণ ও রাধামুকুন্দ একসঙ্গে কাটিয়েছে তার হিসাব নেই। কিন্তু ব্রজসুন্দরীর আক্সনের পর তার মনও দ্বিধা বিভক্ত হতে দেখা যায় তাই দাদার কাছে গিয়ে মৃদুস্বরে জানাল -

'দাদা, আর ও আমার এখানে থাকা হয় না।'

বিষয়টি শশিভূষন আগেই আঁচ করেছিলেন। তাই হেঁসে বললেন - '

টিপ্পনী

‘এই, এতো নুতন কথা নহে। ওতো পরের ঘরের মেয়ে, সুযোগ পাইলেই দুটো কথা লিবে, তাই বলিয়া কি ঘরের লোককে ছড়িয়া যাইতে হইবে ! কথা আমাকেও তো মাঝে মাঝে শুনিতে হয়, তাই বলিয়া তো সংসার ত্যাগ করিতে পারি না।’

রাধামুকুন্দ দাদা শশিভূষণের সংসার যাতে অশান্তি না হয় তার জন্যই এই সিদ্ধান্ত। রাধামুকুন্দ ছাড়া শশিভূষনের কোন শান্তি নেই তা তার কথায় -’তুমি গেলে আমার কিসের শান্তি।’

দিন দিন ব্রজসুন্দরীর আক্রমণ শানিত হতে থাকল। তা যেন রাশমণিকে লক্ষভ করে বর্ষিত হত। এর মধ্যেই এ অদ্ভুত রকম ঘটনা ঘটল - ‘শশিভূষনের একমাত্র জমইদারি পরগনা এনাৎশাহী লাটের খাজনার দায় নিলাম হইয়া গেছে।’

এই নিলাম হওয়ার পিছনে বাধামুকুন্দ শশিভূষনখে জানিয়েছে -’আমারই দোষ’। সংসারে দুই মহিলার মধ্যে পরিবর্তন দেখা গেল। ব্রজসুন্দরীর বিদ্বেষভাব যেন কর্পূের মতো উবে গেল। আর রাসমণির অবস্থান বিপরীতধর্মী। কারন এখন -

‘রাসমণির স্বামীর অন্নেই শশিভূষণ এবং ্রজসুন্দর প্রতিপালিত।’

রাসমনির ব্যবহারের দাম্ভিকতা রাধামুকুন্দের কানে গেলে তাকে সাবধান করে দেয়। তারপর থেকে রাসমণির ‘মুখে আর ‘রা’ রহিলল না, বড়োগিন্নির দাসীর মতো হইয়া রহিল - শুনা যায় ,’ রাসমনি ও রাধামুকুন্দের মধ্যেকার মনোমানিল্য ব্রজসুন্দরীর মধ্যস্থতায় সমাধান সাধিত হল।। রাধামুকুন্দ ব্রজসুন্দরীর হাতেই সংসার খরচের টাকা তুলে দিত । এখন মুকুন্দ ভ্রজসুন্দরীর হাতেই সংসার খরচের টাকা তুলে দিত। এখন সে মোক্তারি করে আয়ের প্রশস্ত ব্যবস্থা করেছে। সংসারের স্বচ্ছলতা ফিরলে ও শশিভূষনের যেন - ‘গোপন অসুখে তিনি প্রতিদিন কৃশ হইয়া যাইতেছিলেন।’

শশিভূষণের হৃদয়ে আঘাত বড় বেশি করে চেপে বসেছে যা থাকে তার মুক্তির যেন পথ নেই - এ ‘বড়ো শক্ত ব্যাধি।’ পৈতৃক সম্পত্তি ফিরে পেলেও তার মধ্যে আনন্দ উল্লাসের কোন প্রকাশ দেখা গেল না। লেখকে অসাধারণ বর্ণনা -

‘বহুদিন অব্যবহারে হৃদয়ের বীণাযন্ত্র বোধ করি বিকল হইয়া গিয়াছে, এখন সহস্রবার তার টানিয়া বাঁধিলে ও টিলা হইয়া নামিয়া যায় - সে সুর আর কিছুতেই বাহির হয় না।’

রাধামুকুন্দের বিশ্বাসঘাতকতে দাদার হৃদয়ে বজ্রাঘাত সম হয়ে উঠেছে। সেই চিন্তাই তার এ গোপন সূত্রে জেনে গিয়েছীলেন । শশিভূষণের অবর্তমানে সম্পত্তিভাগের বিষয় উঠলে শশিভূষণের যে কিছু নেই তা জানিয়ে বলেছেন -

'এককালে আমার ছিল, এখন আমার নহে।'

দাদা শশিভূষণের অভিপ্রায় ও শারীরিক অবস্থা বুঝে রাধামুকুন্দ দাদার পা ধরে সত্য কথা প্রকাশ করল -

'দাদা, আমি যে মহাপাতকের কাজ করিয়াছি, তাহা তোমাকে বলি, আর তো সময় নাই।'

দীর্ঘনিশ্বাসই প্রমাণ দিল তনি জীবনের সায়াহ্নে উপনীত হয়ে ও বিষয়টি অবগত আছেন। আজ জগৎ জীবন - সমাজ সংসার বন্ধু সকল বিষয়ে সার বুঝতে পেরেছেন। বিচ্ছেদযাতে না তৈরি হয় তার জন্যই রাধামুকুন্দ এই মহাপাতকের কাজ করেছিলেন। তাই শশিভূষণের ভাইয়ের প্রতি বাক্‌রুদ্ধ উচ্চারণ -

'ভা্ ভালোই করিয়াছিলি। কিন্তু যেজন্য এত করিলে তাহা কি সিদ্ধ হইল। কাছে কি রাখিতে পারিলে। দয়াময় হরি।'

রাধামুকুন্দের বার বার মাপ করে দেওয়ার কথা শুনে দাদা শশিভূষণ এ মার্জনা পূর্বেই করা হয়েছে তা প্রিয় ভাইকে জানিয়ে দিয়েছেন, গল্পের অন্তিমে করুন বিচ্ছেদের রাগিনী বেজে উঠল এবং শশিভূষনের 'দক্ষিণ হস্ত' দিয়ে নির্দেশ আজো আমাদের তাড়িয়ে বেড়ায়।

আদর্শ প্রশ্নমালা :

ক. 'দানপ্রতিদান' গল্পটির বিষয়বস্তু অনুসারে নামকরণ কি সঙ্গত মনে কর ? আলোচনা কর।

খ. 'দাদা, আর তো আমার এখানে থাকা হয় না।' - উদ্ধৃত অংশটি কোথা থেকে নেওয়া হয়েছে ? কে, কাকে, কোন প্রসঙ্গে এ কথা বলেছেন ব্যাখ্যা কর।

গ. 'দানপ্রতিদান' গল্পের দুই নারীচরিত্র পর্যালোচনা কর।

ঘ. 'ও ছেলেমানুষ, উহাকে মাপ করো।' - উদ্ধৃত বক্তব্যের লক্ষ্য কাকে উদ্দেশ্য করে এবং কেন ? পর্যালোচনা কর।

ঙ. 'গোপন অসুখে তিনি প্রতিদিন কৃশ হইয়া যাইতেছিলেন।' - কে, কি কারনে আমন অবস্থা প্রাপ্ত হয়ে পড়েছেন আলোচনা কর।

চ. 'সংসারে একটা এই মহৎ পরিবর্তন দেখা গেল' - কি এই পরিবর্তন ? নিজের ভাষায় ব্যক্ত কর।

ছ. 'তিনি যেন ঘাটের বাঁধা সোপান হইতে পিছলিয়া এক মুহূর্তে ডুবজলে গিয়া পড়িলেন।' - কার সম্পর্কে একথা গুলি বলা হয়েছে ? এরকম অবস্থা হওয়ার কারন কি ?

জ. রাধামুকুন্দ চরিত্রটি ব্যাখ্যা কর।

টিপ্পনী

টিপ্পনী

ঝ. ‘তুমি যাহাদের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়াছিলে তাহারাই আমার নিকট প্রকাশ করিয়াছে। আমি তখন তোমাকে মাপ করিয়াছি।’ - বক্তার চরিত্র বিশ্লেষণ কর।

পুঁই মাচা

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

টিপ্পনী

সহায়হরি চাটুয্যে উঠানে পা দিয়াই স্ত্রীকে বলিলেন - একটা বড় বাটি কি ঘটী যা হয় কিছু দাও তো, তারক পুড়ো গাছ কেটেছে, একটু ভাল রস আনি।

স্ত্রী অন্নপূর্না খড়ের রান্নাঘরের দাওয়ায় বসিয়া শীতকালের সকাল বেলা নারিকেল তেলের বোতলে ঝাঁটার কাটি পুরিয়া দুই আঙুলের সাহায্যে ঝাঁটার কাটিলগ্ন জমানো তেলটুকু সংগএরহ করিয়া চুলে মাখাইতেছিলেন। স্বামীকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি গায়ের কাপড় একটু টানিয়া দিলেন মাত্র, কিন্তু বাটি কি ঘটী বাহির করিয়া দিবার জন্য বিন্দুমাত্র আগ্রহ তো দেখাইলেন না, এমন কি বিশেষ কোনো কথাওও বলিলেন না।

সহায়হরি অগ্রবর্তী হইয়া বলিলেন - কি হয়েচে, ব'সে রইলে যে? দাও না একটা ঘটী ? আঃ ক্ষেন্তি টেন্তি সব কোথায় গেল এরা? তুমি তেল মেখে বুঝি ছোঁবে না?

অন্নপূর্না তেলের বোতলটি সরাইয়া স্বামীর দিকে খানিকক্ষন চাহিয়া রহিলেন, পরে অত্যন্ত শান্ত সুরে জিজ্ঞাসা করিলেরন - তুমি মনে মনে কি ঠাউরেছ বলতে পার?

স্ত্রীর অইরিক্ত রকমের শান্ত সুরে সহায়হরি মনে ভীতির সঞ্চার হইল - ইহা যে ঝড়ের অব্যবহিত পূর্বের আকাশের স্থিরভাব মাত্র, তাহা বুঝিয়া তিনি মরীয়া হইয়া ঝড়ের প্রতীক্ষায় রহিলেন। একটু আমতা আমতা করিয়া কহিলেন কেন ... কি আবার ... কি...

অন্নপূর্না পূর্বাপেক্ষাও শান্ত সুরে বলিলেন - দেখ, রঙ্গ কোরো না বলছি ন্যাকামি করতে হয় অন্য সময় কোরো। তুমি কিছু জান না খোঁজ রাখ না। অতবড় মেয়ে যার ঘরে, সে মাছ ধরে আর রস খেয়ে দিন কাটায় কি ক'রে তা বলতে পার? গাঁয়ে কি গুজব রটেছে জান?

সহায়হরি আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন - কেন? কি গুজব?

কি গুজব জিজ্ঞাসা করো গিয়ে চৌধুরীদের বাড়ি। কেবল বাগদী দুলে পাড়ায় ঘুরে ঘুরে জন্ম কাটালে ভদ্দরলোকের গাঁয়ে বাস করা যায় না। - সমাজে থাকতে হলে সেই রকম মেনে চলতে হয়।

সহায়হরি বিস্মিত হইয়া কি বলিতে যাইতেছিলেন, অন্নপূর্না পূর্ববৎ সুরেই পূর্নবার বলিআ উঠিলেন - একঘরে করবে গো, তোমাকে একঘরে করবে, কাল চৌধুরীদের চন্ডীমন্ডপে এসব কথা হয়েছে। আমাদে হাতে ছোঁয়া জল আর কেউ খাবে না। আশীর্বাদ হয়ে মেয়ের বিয়ে

টিপ্পনী

হলো না - ও নাকি উচ্ছুগণ্ড করা মেয়ে - গাঁয়ের কোন কাজে তোমাকে আর কেউ বলবে না - যাও, ভালোই হয়েছে তোমার। এখন দুলে বাড়ী, বাগদী বাড়ী উঠে ব'সে দিন কাটাও।

সহায়হরি তাচ্ছিল্যের ভাব প্রকাশ করিয়া বলিলেন - এই ! আমি বলি, না জানি কি ব্যাপার। একঘরে ! সবাই একঘরে করেচেন, এবার বাকিই আছেন কালীময় ঠাকুর ! - ওঃ!

অন্নপূর্না তেলে - বেগুমনে জ্বলিয়া উঠিলেন - কেন তোমাকে একঘরে করতে বেশী কিছু লাগে নাকি ? তুমি কি সমাজের মাথা, না একজন মাতব্বর লোক ? চাল নেই চুলো নেই, একড়ার মোরোদ নেই, চৌধুরিরা তোমায় একঘরে করবে তা আর এমন কঠিন কথা কী ? - আর সত্যিই তি, এদিকে ধাড়ী মেয়ে হয়ে উঠল। হঠাৎ স্বর নামাইয়া বলিলেন হলো যে পনেরো বছরের, বাইরে কমিয়ে ব'লে বেড়ালে কি হবে, লোকের চোখ নেই ? পুনরায় গলা উঠাইয়না বলিলেন - না বিয়ে দেবার গা, না কিছু। আমি কি যাব পাত্তর ঠিক করতে ?

সশরীরে যতক্ষন স্ত্রীর সম্মুখে বর্তমান থাকিবেন, স্ত্রীর গলার সুর ততক্ষন কমিবার কোনো সম্ভাবনা নাই বুঝিয়া সহায়হরি দাওয়া হইতে তাড়াতাড়ি একটি কাঁসার বাটি উঠাইয়া লইয়া খিড়কী দুয়ার লক্ষ্য করিয়া যাত্রা করিলেন - কিন্তু খিড়কী দুয়ারের একটু এদিক কি দেখিয়া হঠাৎ থামিয়া গেলেন এবং আনন্দপূর্ণস্বরে বলিয়া উঠিলেন - এসবকি রে ! ক্ষেন্তি মা, এসব কোথা থেকে আনলি ? ও ! এ যে..

চোদ্দ-পনের বছরের একটি মেয়ে আর দুটি ছোট ছোট মেয়ে পিছনে পিছনে লইয়া বাড়ী ঢুকিল ল তাআর হাতে এক বোঝা পুঁই শাক, ডাঁটাগুলি মোটা ও হলদে, হলদে চেহারা দেখিয়া মনে হয় কাহারা পাকা পুঁই গাছ উপড়াইয়া ফেলিয়া উঠানের জঙ্গল তুলিয়া দিতেচিল, মেয়েটি তাহাদের উঠানের জঞ্জাল প্রণপণে তুলিয়া আনিয়াছে। ছোট মেয়ে দুটির মধ্যে একজনের হাত খালি, অপরটি হাতে গোটা দুই-তিন পাকা পুঁইপাতা জড়ানো কোনো দ্রব্য।

বড় মেয়েটি খুব লম্বা, গোলগাল চেহারা, মাথার চুলগুলো কৃষ্ণ ও অগোছালো - বাতাসে ইড়িতেছে, মুখখানা খুব বড়, চোখ দ'টা ডাগর ডাগর ও শান্ত। সরু সরু কাঁচের চুড়িগুলা দ'পয়সা ডজনের একটি সেফটিপিন দিয়া এক্র করিয়া আটকানো। পিনটির বয়স খঁজিতে যাইলে প্রাগৈতিহাসিক যুগে গিয়া পড়িতে হয়। এই বড় মমেয়েটির নামই বোধহয় ক্ষেন্তি, কারন সে তাড়াতাড়ি পিছন ফিরিয়া পশ্চাদ্বর্তিনীর হাত হইতে পুঁই পাতা জড়ানো দ্রব্যটি লইয়া মেলিয়া ধরিয়া বলিল চিংড়ি মাছ, বাবা। গয়া বুড়ীর কাছ থেকে রাস্তায় নিলাম, দিতে চায় না, বলে - তোমার বার কাছে আরদিনকার দরুণ দু'টো পয়সা বাকি আএ ; আমি বললাম দাও গয়া পিসী, আমার বাবা কি তোমার দু'টো পয়সা নিয়ে পালিয়ে যাবে - আর এই পুঁই শাকগুলো ঘাটের ধারে রাব কাকা বললে, নিয়ে যা - কেমন মোটা মোটা.....

অন্নপূর্ন্না দাওয়া হইতেই অত্যন্ত ঝাঁজের সহিত চীৎকার করিয়া উঠিলেন - নিয়ে যা ! আহা, কি অমর্তই তোমাকে তারা দিয়েছে। পাকা পুঁইডাটা, কাঠ হয়ে গিয়েছে, দুদিন পরে ফেলে দিত ... নিয়ে যা, আর উনি তাদের আগাছা উঠিয়ে নিয়ে এসেছেন - নভালোই হয়েছে, তাদের আর নিজেদের কষ্ট ক'রে কাটতে হলো না। যত পাথুরে বোকা সব মরতে আসে আমার ঘাড়ে ... ধাড়ী মেয়ে, ব'লে দিয়েছি না তোমায় বাড়ীর বাইরে কোথাও পা দিও না ? লজ্জা করে না এ পাড়া সে পাড়া ক'রে বেড়াতে। বিয়ে হলে চার ছেলের মা হতে ? খাওয়ার নামে আর জ্ঞান থাকে না, না ? ... কোথায় শাক, কোথায় বেগুন ; আর একজন বেড়াচ্ছেন - কোথায় রস, কোথায় পাঁশ ... ফেল্ বলছি ওসব ..... ফেল।

মেয়েটি শান্ত অথচ ভয়মিশ্রিত দৃষ্টিতে মার দিকে চাহিয়া হাতের বাঁধন আলগা করিয়া দিল, পুঁই শাকের বোঝা মাটিতে পড়িয়া গেল। অন্নপূর্যা বকিয়া চলিলেন, - যা তো রাধী, ও আপদগুলো টেনে খিড়কীর পুকুরের ধারে ফেলে দিয়ে আয় তো ... ফের যদি বাড়ীর বার হতে দেখিছি, তবে ঠ্যাং যদি খোঁড়া না করি তো .....

বোঝা মাটিতে পোড়িয়া গিয়াছিল। ছোট মেয়েটি কলের পুতুলের মতন সেগুলি তুলিয়া লইয়া, খিড়কী অভিমুখে চলিল, কিন্তু ছোট মেয়ে অত বড় বোঝা আঁকড়াতে পারিল না, অনেকগুলি ডাটা এদিক ওদিকে ঝুলিতে ঝুলিতে চলিল। .. সহায়হরি ছেলেমেয়েরা তাদের মাকে অত্যন্ত ভয় করিত।

সহায়হরি আমতা আমতা করিয়া বলিতে গেলেন - তা এনেছে ছেলেমানুষ খাবে বলে ... তুমি আবার ..... বরং....

পুঁইশাকের বোঝা লইয়া যাইতে যাইতে ছোট মেয়েটি ফিরিয়া দাঁড়াইয়া মা'র মুখের দিকে চাহিল। অন্নপূর্ণা তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন - না না, নিয়ে যা, খেতে হবে না - মেয়ে মানুষের আবার অত নোলা কিসের। এক পাড়া থেকে আর একপাড়ায় নিয়ে আসবে দুটো পাকা পুঁইশাক ভিক্ষে ক'রে। যা, যা .... তুই যা, দূর ক'রে বনে দিয়া আয় ...

সহায়হরি বড় মেয়ের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন তাহার চোখ দু'টা জলে ভরিয়া আসিয়াছে। তাঁর মনে বড় কষ্ট হইল। কিন্তু মেয়ের যতই সাধের জিনিস হোক, পুঁই শাকের পক্ষাবলম্বন করিয়া দুপুরবেলা স্ত্রীকে চটাইতে তিনি আদৌ সাহসী হইলেন না - নিশব্দে খিড়কী দোর দিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

বসিয়া রাঁধিতে রাঁধিতে বড় মেয়ের মুখের কাতর দৃষ্টি স্মরণে পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে অন্নপূর্ণার মনে পড়িল - গত অরন্ধনের পূর্বদিনে বাড়িতে পুঁইশাক রান্নার সময় ক্ষেন্তি আবদার

টিপ্পনী

টিপ্পনী

করিয়া বলিয়াছিল - মা, অর্ধেকগুলো কিন্তু একা আমার, অর্ধেক সব মিলে তোমাদের ....

বাযীতে কেহ ছিল না, তিনি নিজে গিয়া উঠানের ও খিড়কীর দোরের আশে পাশে যে ডাঁটা পড়িয়াছিল, সেগুলি কুড়াইয়া লইয়া আসিলেন - বাকিগুলা কুড়ানো যায় না, ডোবায় ধারের ছাই গাদায় ফেলিইয়া দিয়াছে। কুচো চিংড়ি দিয়া এইরূপে চুপি চুপি পুঁইশাকের তরকারী রাঁধিলেন।

দুপুরবেলা ক্ষেন্তি পাতে পুঁই শাকের চচ্চড়ি দেখিয়া বিস্ময় ও আনন্দপূর্ন ডাগর চোখে মায়ের দিকে ভয়ে ডয়ে চাহিল। দু-এক বার এদিক ওদিক ঘুরিয়া আসিতেই অন্নপূর্না দেখিলেন উকন্তু পুঁইশাকের একটুকরাও তাহার পাতে পড়িয়া নাই। পুঁইশাকের উপর তাঁহার এই মেয়েটির কিরূপ লোভ তাহা তিনি জানিতেন, জিজ্ঞাসা করিলেন - কিরে ক্ষেন্তি, আর একটু চচ্চড়ি দিই ? ক্ষেন্তি তৎক্ষনাৎ ঘাড় নাড়িয়া এ আনন্দজনক প্রস্তাব সমর্থন করিল। কি ভাবিয়া অন্নপূর্নার চোখে জল আসিল, চাপিতে গিয়া তিনি চোখ উঁচু করিয়া চালের বাতায় গোঁজা দালা হইতে শুকনা লংকা পাড়িতে লাগিলেন।

কালীমায়ের চন্ডীমন্ডপে সেদিনন বৈকাল বেলা সহাহরির ডাক পড়িল । সংক্ষিপ্ত ভূমিকা ফাঁদিবার পর কালীময় উত্তেজিত সুরে বলিলেন - সে সব দিন কি আর আছে ভায় ? এই ধর, কেষ্ট মুখুয্যে . স্বভাব নৈলে পাত্র এব না, স্বভাব নৈল পাত্র দেব না ক'রে কি কান্দটাই করলে - অবশেষে কিনা হরির ছেলেটাকে ধরে প'ড়ে মেয়ের বিয়ে দেয়, তবে রক্ষে। তারা কি স্বভাব। রাম বল ছ-সাত পুরুষে ভঙ্গ, পচা শ্রিত্রিয়। পরে সুর নরম করিয়া বলিলেন - তা সমাজের সে সব শাসনের দিন কি আর আছে ? দিন দিন চ'লে যাচ্ছে। বেশি দূর যাই কেন, এই যে তোমার মেয়েটি তেরো বছরের ...

সহায়হরি বাধা দিয়া বলিতে গেলেন - এই শ্রাবণে তেরোয় .....

আহা -হা, ... তেরোয় আর ষোলোয় তফাৎ কিসের শুনি ? তেরোয় আর ষোলোয় তফাৎটা কিসের ? আর সে তেরোই ওক, চাই ষোলোই হোক, চাই পঞ্চাশই হোক তাতে আমাদের দরকার নেই, সে তোমার হিসেব তোমার কাছে। কিন্তু পাত্তর আশীর্বাদ হয়ে গেল, তুমি বেঁকে বসলে কি জন্যে শুনি ? ও তো একরকম উচ্ছুগ্‌গু করা মেয়ে। আশীর্বাদ হওয়া ও যা বিয়ে হওয়া ও তা, সাত পাকের যা বাকি, এই তো ....সমাজে ব'সে এ-সব কাজগুলো তুমি যে করবে আর আমরে ব'সে ব'সে দেখব এ তুমি মনে ভেব না। সমাজের বামুনদের যদি জাত মারবার ইচ্ছে না থাকে, মেয়ের বিয়ের বন্দোবস্ত ক'রে ফেল. পাত্তর, পাত্তর, রাজপুত্তুর না হলে পাত্তর মেলে না ? গরীব মানুষ, দিতে থুতে পারবে না বলেই শ্রীমন্ত মজুমদারের ছেলেকে ঠিক করে দিলুম। লেখাপড়া নাই বা জানলো ? জজ মেজেস্টার না হলে কি মানুষ হয় না ? দিব্যি

বাড়ী বাগান পুকুর, শুনলাম এবার কুঁড়ির জমিতে চাট্টী আমন ধানও করেছে, ব্যস্ - রাজার হাল। দুই ভাইয়ের অভাব কি ?..

টিপ্পনী

ইতিহাসটা হইতেছে এই যে মণিগাঁএর উক্ত মজুমদার মহাশয়ের পুত্রটি কালীময়ই ঠিক করিয়া দেন। কেন কালীময় মাধা ব্যথা করিয়া সহায়হরির মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধ মজুমদার মহাশয়ের ছেলের সঙ্গে ঠিক করিতে গেলেন তাহার নির্দেশ করিতে যাইয়া কেহ বলেন যে, কালীময় নাকি মজুমদার মহাশয়ের কাছে অনেক টাকা ধার ধারেন, অনেকদিনের সুদ পর্যন্ত বাকি - শীঘ্র নালিশ হিবে, ইত্যাদি। এ গুজব যে শুধু অবাস্তব তাহাই নহে ইহার কোন ভিত্তি আছে বলিয়াও মনে হয় না। ইহা দুষ্ট পক্ষের রটনা মাত্র। যাহাই হউক পাত্রপক্ষ আশীর্বাদ করিয়া যাওয়ার দিন কতক পরে সহায়হরি টের পান পাত্রটি কয়েকমাস পূর্বে নিজের গ্রামে কি একটা করিবার ফলে গ্রামের এক কুম্ভকার বধূর আত্মীয় স্বজনের হাতে বেদম প্রহার খাইয়া কিছুদিন নাকি শয্যাগত ছিল। এরকম পাত্রে মেয়ে দিবার প্রস্তাব মনঃপুত না হওয়ায় সহায়হরি সে সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া দেন।

দিন দুই পের কথা। সকালে উঠিয়া সহায়হরি উঠানে বাতাবীলেবু গাছ এর ফাঁক দিয়া যেটুকু নিতান্ত কচি রাঙা রৌদ্র আসিয়াছল, তাহারই আতপে বসিয়া আপন মনে তামাক টানিতেছেন। বড় মেয়ে খেন্তি আসিয়া চুপি চুপি বলিল - বাবা, যাবে না? মা ঘাটে গেল .....

সহায়হরি একবার বাড়ীর পাশে ঘাতের পথের দিকে কি জানি কেন চাহিয়া দেখিলেন, পরে নিম্নস্বরে বলিলেন - যা শীগগির শাবলখানা নিইয়ে আয় দিকি। কথা শেষ করিয়া তিনি উৎকণ্ঠার সহিত জোরে জোরে তামাক টানিতে লাগিলেন এবং পুনরায় একবার কি জানি কেন খিড়কীর দিকে সতর্ক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। ইতিমধ্যে প্রকান্ড ভারীই একটা লোহার শাবল দুই হাত দিয়া আঁকড়াইয়া ধরিয়া ক্ষেন্তি আসিয়া পড়িল - তৎপরে পিতা পুত্রাতে সন্তর্পণে সম্মুখের দরজা দিয়া বাহির হইয়া গেল - ইহাদের ভাব দেখিয়া মনে হইতেছিল ইহারা কাহারো ঘরে সিঁদ দিবার উদ্দেশ্যে চলিয়াছে।

অন্নপূর্ণা স্নান করিয়া সবে কাপড় ছাড়িয়া উনুন ধরাইবার যোগাড় করিতেছেন - মুখুয্যে বাড়ীর ছোট খুকী দূর্গা আসিয়া বলিল - খুড়িমা, মা ব'লে দিলে খুড়ি মাকে গিয়ে বল্, মা ছোঁবে না তুমি আমাদের নবান্নটা মেখে আর ইতুর ঘটগুলো বার ক'রে দিয়া আসবে?

মুখুয্যে বাড়ী ও পাড়ায় - যাইবার পথের বাঁ ধারে এক জাবগায় শেওড়া, বনভাঁট, রাংচিতা, বনচালতা গাছের ঘন বন। শীতের সকালে এক প্রকার লতাপাতার ঘন গন্ধ বন হইতে বাহির হইতেছিল। একটা লেজঝোলা হলদেপাখী আমড়া গাছের এ-ডালে হইতে ও ডালে যাইতেছে।

টিপ্পনী

দুর্গা আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিল - খুড়িমা, ঐ যে কেমন পাখীটা। পাখী দেখিতে গিয়া অন্নপূর্ণা কিন্তু আর একটা জিনিস লক্ষ্য করিলেন। ঘন বনটার মধ্যে কোথায় এতক্ষন খুপ খুপ করিয়া আওয়াজ হইতেছীল কে যেন খুঁড়িতেছে ... দুর্গার কথার পরেই হঠাৎ সেটা বন্ধ হইয়া গেল। অন্নপূর্ণা সেখানে খানিকক্ষণ থমকিয়া দাঁড়াইলেন, পরে চলিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার খানিকদূরে যাইতে বনের মধ্যে পুনরায় খুপ খুপ শব্দ আরম্ভ হইল।

কাজ করিয়া ফিরিতা অন্নপূর্নার কিছু বিলম্ব হইল। বাড়ী ফিরিয়া দেখিলেন, ক্ষেন্তি উঠানের রৌদ্রে বসিয়া তেলের বাটি সম্মুখে লইয়া খোঁপা খুলিতেছে। তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মেয়ের দিকে চাহিয়া দেখিয়া বলিলেন - এখনও নাইতে যাসনি যে, কোথায় চিলি এতক্ষণ?

ক্ষেন্তি তাড়াতাড়ি উত্তর দিল - এই যে যাই মা, এক্ষুনি যাব আর আসব।

ক্ষেন্তি স্নান করিতে যাইবার একটুখানি পরেই সহায়হরি সোৎসাহে পনেরো - ষোল সের ভারী আকতা মেটে আলু ঘাড়ে করিয়া কোথা হইতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং সম্মুখে স্ত্রীকে দেখিয়া কৈফিয়তের দৃষ্টিতে সেই দিকে চাহিয়াই বলিয়া উঠিলেন - ওই ও পাড়ায় ময়শা চৌকিদার রিজই বলে কর্তা থাকুর,তোমার বাপ থাকতে তবু মাসে মাসে এদিকে তোমাদের পায়ের ধূলো পড়ত, তা আজকাল তো তোমরা আর আস না, এই বেড়ার গায়ে মেটে আলু ক'রে রেখেছি, তা দাদাঠাকুর বরং.

অন্নপূর্না স্থির দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে চাহিয়া বলিলেন - বরোজপাতার বনের মধ্যে বসে খানিক আগে কি করছিলে শুনি?

সহায়হরি অবাক হইয়া বলিলেন - আমি। না আমি কখন? কক্ষনো না, এই তো আমি। সহায়হরি ভাব দেখিয়া মনে হইতেছিল তিনি এইমাত্র আকাশ হইতে পড়িয়াছেন।

অন্নপূর্না পূর্বের মতনই স্থির দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে চাহিয়া বলিলেন - চুরি তো করবেই, তিন কাল গিয়েছে এক কাল আছে, মিথ্যে কথাগুলো আর এখন বোলো না। আমি সব জানি। মনে ভেবেছিলে আপদ ঘাটে ইয়েছে আর কি ... দুর্গার মা ডেকে পাঠিয়েছিল, ও পাড়ায় যাচ্ছি, শুনলাম বরোজপাতার বনের মধ্যে কি সব খুপ খুপ শব্দ তখনি আমি বুঝতে পেরিছি, সাড়া পেয়ে শব্দ বন্ধ হয়ে গেল, যেই আবার খানিকদূর গেলাম আবার দেখি শব্দ ... তোমার তো ইহকাল ও নেই, চুরি করতে, ডাকাতি করতে, যা করতে ইচ্ছে হয় কর কিন্তু মেয়েটাকে আবার এর মধ্যে নিয়ে গিয়ে ওর মাথা খাওয়া কিসের জন্য?

সহায়হরি হাত নাড়িয়া, বরিজপাতায় তাঁহার উপস্থিতি থাকার বিরুদ্ধে কতকগুলি প্রমাণ উত্থাপন করিবার চেষ্টা করিতে গেলেন ; কিন্তু স্ত্রীর চোখের দৃষ্টির সামনে তাঁহার বেশী

কথাও যোগাইল না, বা কথিত উক্তিগুলির মধ্যে কোন পৌর্বাপর্য সম্বন্ধও খুঁজিয়া পাওআ গেল না।

আধঘন্তা পরে ক্ষেন্তি স্নান করিয়া, বাড়ী ঢুকিল। সম্মুখস্থ মেটে আলুর দিকে একবার আড়চোখে চাহিয়াই নিরীহমুখে উঠানের আলনায় অত্যন্ত মনোযোগের সহিত কাপড় মেলিয়া দিতেছিল।

অন্নপূনর্না ডাকিলেন - ক্ষেন্তি, এদিকে একবার আয় তো শুনে যা ...

মায়ের ডাক শুনিয়া ক্ষেন্তির মুখ শুকাইয়া গেল - সে ইতস্তত করিতে করিতে মার নিকটে আসিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন - এই মেটে আলুটা দু' জনে মিলে তুলে এনেছিস, না?

ক্ষেন্তি মার মুখের দিকে একটুখানি চাহিয়া থাকিয়া একবার ভূপতিত আলুটার দিকে চাহিল, পরে পুনরায় মার মুখের দিকে চাহিল এবং সঙ্গে সঙ্গে ক্ষিপ্রদৃষ্টিতে একবার বাড়ীর সমউখস্থ বাঁশঝাড়ের মাথার দিকেও চাহিয়া লইল ; তাহার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিল, কিন্তু মুখ দিয়া কথা বাহির হিল না।

অন্নপূর্ণা কড়া সুরে বলিলেন - কথা বলছিস না যে বড়? এই মেটে আলু তুই এনেছিস কি না?

ক্লান্তি বিপন্ন চোখে মার মুখের দিকেই চাহিয়া ছিল? এই মেটে আলু তুই এনেছিস কি না?

ক্ষেন্তি বিপন্ন চোখে মার মুখের দিকেই চাহিয়া ছিল, উত্তর দিল - হুঁযা।

অন্নপূর্যা তেলে বেগুনে জ্বলিয়া উঠিয়া বলিলেন - পাজী আজ তোমার পিঠে আমি আস্ত কাঠের চেলা ভাঙব তবে ছাড়ব, বরিজপাতার বনে গিয়ৈছে মেটে আলু চুরি করতে। সোন্ত মেয়ে, বিয়ের যুগ্যি হয়ে গেছে কোন কালে, সেই এক গলা বিজন বন, যার মধ্যে দিন দুপুরে বাঘ লুকিয়ে থাকে, তার মধ্যে থেকে পরে আলু নিয়ে এল ... তুলে? যদি গোঁসাইরা চৌকিদার ডেকে তোমায় ধরিয়ে দেয় ? তোমার কোন্ শ্বশুর এসে তোমায় বাঁচাত ? আমার জোটে খাব, না জোটে না খাব, তা বলে পরের জিনিসে হাত? এ মেয়ে নিয়ে ..

দু-তিন দিন পরে একদিন বৈকালে, ধূলামাটি মাখা হাতে ক্ষেন্তি মাকে আসিয়া বলিল - মা মা দেখবে এস ....

অন্নপূর্ণা গিয়া দেখিলেন ভাঙ্গা পাঁচিলের ধারে যে ছোট খোলা জমিতে কতকগুলি

টিপ্পনী

টিপ্পনী

পাথরকুচি ও কন্টককারীর জঙ্গল হইয়াছে, ক্ষেন্তি ছোট বোটিকে লইয়া সেখানে মহা উৎসাহে তরকারির আওলাত করিবার আয়োজন করিতেছে এবং ভবিষ্যম্ভাবী নানাবিধ কাল্পনিক ফলমূলের অগ্রদূত -স্বরূপ বর্তমানে কেবল একটিমাত্র শীর্ণকায় পুইশাকের চারা কাপড়ের ফালির গ্রন্থি বদ্ধ হইয়া ফাঁসি হইয়া যাওয়া আসামীর মতন উর্ধ্বমুখে একখন্ড শুষ্ক কঞ্চির গায়ে ঝুলিয়া রহিয়াছে। ফলমূলাদিরর অবশিষ্টগুলি আপাতত বড় মেয়ের মস্তিষ্কের মধ্যে অবস্থিত করিতেছে, দিনের আলো এখনও বাহির হয় নাই।

অন্নপূর্ণা হাসিয়া বলিলেন - দূর পাগলী, এখন পুঁই ডাঁটার চারা পোঁতে কখনো / বষফাকালে পুঁততে হয়। এখন যে জল না পেয়ে মরে যাবে?

ক্ষেন্তি বলল - কেন, আমি রিজ জল ঢালব?

খুব শীত পড়িয়াছে। সকালে উঠিয়া সহায়হরি দেখিলেন তাঁহার দুই ছোট মেয়ে দোলাই গায়ে বাঁধিয়া রোদ উঠিবার প্রত্যাশায় উঠানের কাঁঠালতলায় দাঁড়াইয়া আছে ল একটা ভাঙ্গেআ ঝুড়ি করিয়া ক্ষেন্তি শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে মুখুজ্যর বাড়ী হইতে গোবর কুড়াইয়া আনিল। সহায়হরি বলিলেন - ইঁ্যা মা ক্ষেন্তি, তা সকালে উঠে জামাটা গায়ে দিতে তোর কি হয়? দেখ দিকি এই শীত?

আচ্ছা দিচ্ছি বাবা - কই শীত, তেমন তো .....

-ইঁ্যা, দে মা, এক্ষুনি দে - অসুখ-বিসুখ পাঁচ রকম হতে পারে বুঝলি নে? সহায়হরি বাহির হইয়া গেলেন, ভাবিতে ভাবিতে গেলেন, তিনি কি অনেকদিন মেয়ের উখে ভালো করিয়া চাহেন নাই ? ক্ষেন্তির মুখ এখন সুশ্রী হইয়া উঠিয়াছে?

জামার ইতিহাসে নিম্নলিখিত রূপ। বহু বৎসর অতীত হইল, হরিপুরের রাসের মেলা হইতে সহায়হরি কালো সার্জের এই আড়াই টাকা মুল্যের জামাটি ক্রয় করিয়া আনেন। ছিঁড়িয়া যাইবার পর তাহাতে কতবার রিফু ইত্যাদি করা হইয়াছিল, সম্প্রতি গত বৎসর হইতে ক্ষেন্তির স্বাস্থ্যোন্নতি হওয়ার দরুণ জামাটি তাহার গায়ে হয় না। সংসারের এসব খোঁজ সহায়হরি কখনও রাখিতেন না। জামার বর্তমান অবস্থা অন্নপূর্নারও জানা ছিল না - ক্ষেন্তির নিজস্ব ভাঙা টিনের তোরঙ্গের মধ্যেই উহা থাকিত।

পৌষ সংক্রান্তি । সন্ধ্যাবেলা অন্নপূর্না একটা কাঁসিতে চালের গুঁড়া, ময়দা ও গুড় দিআ চটকাইতেছিলেন - একটা ছোট বাটিতে একবাটি তেল। ক্ষেন্তি কুরুনির নীচে একটা কলার পাতা পাতিয়া এক থাল নারিকেল কুরিতেছে। অন্নপূর্না প্রমে ক্ষেন্তির সাহায্য লইতে স্বীকৃত হন নাই, কারণ সে যেখানে সেখানে বসে, বনে-বাদাড়ে ঘুরিয়া ফেরে, তাহার কাপড় চোপড়

শাস্ত্রসম্মত ও শুচি নহে। অবশেষে ক্ষেন্তি নিতান্ত ধরিয়া পড়ায় হাত পা ধোয়াইয়া ও শুষ্ক কাপড় পরাইয়া তাহাকে বর্তমান পদে নিযুকত করিয়াছেন।

ময়দার গোলা মাখা শেষ হইলে অন্নপূর্না উনুনে খোলা চাপাইতে যাইতেছেন, ছোট মেয়ে রাধী হঠাৎ ডান হাতখানা পাতিয়া বলিল - মা ঐ একটু।

অন্নপূর্ণা বড় গামলাটা হইতে একটুখানি গোলা তুলিয়া লইয়া হাতের আঙুল পাঁচটি দ্বারা একটি বিশেষ মুদ্রা রচনা করিয়া সেটুকু পরসরিত হাতের উপর দিলেন। মেজ মেয়ে পুঁটি অমনি ডান হাতখানা কাপড়ে তাড়াতাড়ি মুছিয়া লইয়া, মার সামনে পাতিয়া বলিল - মা, আমায় একটু ...

ক্ষেন্তি শুচিবস্ত্রে নারিকেল কুরিতে কুরিতে লুব্ধ নেত্রে মধ্যে মধ্যে এদিকে চাহিতেছিল, এ সময় খাইতে চাওয়ায় মা পাছে বকে, সেই ভয়ে চুপ করিয়া রহিল।

অন্নপূর্ণা বলিলেন - দেখি, নিয়ে আয় কএন্তি ঐ নারকেল মালাটা, ওতে তোর জন্য একটু রাখি। ... ক্ষেন্তি ক্ষিপ্র হস্তে নারিকেলের উপরের মালাখানা, যাহাতে ফুটা নাই, সেখানা সরাইয়া দিল, অন্নপূর্ণা তাহাতে একটু বেশি করিয়া গোলা ঢালিয়া দিলেন।

মেজমেয়ে পুঁটি বলিল - জেঠাইমারা অনেকখানি দুধ নেয়েছে, রাঙাদিদি ক্ষীর তৈরী করছিল, ওদের অনেক রকম হবে।

ক্ষেন্তি মুখ তুলুয়া বলিল - এ বেলা আবার হবে নাকি ? ওরা তো ও-বেলা ব্রাহ্মণ নেমন্তন্ন করেছিল সুরেশ কাকাকে আর ও পাড়ার তিনুর বাবাকে। ও বেলা তো পায়েস, ঝোল-পুলি, মুগতিক্ত এইসব হয়েছে।

পুঁটি জিজ্ঞাসা করিল - হঠ্যা মা, ক্ষীর নৈলে নাকি পাটিসপটা হয় না ? খেঁদি বলছিল, ক্ষীর পুর না হলে আর পাটিসপটা হয় ? আমি বললাম কেন, আমার মা তো শুধু নারকেলের ছাঁই দিয়া করে, সে তো কেমন লাগে।

অন্নপূর্ণা বেগুনের বোঁটায় একটুখানি তেল লইয়া খোলায় মাখাইতে মাখাইতে প্রশ্নের সদুত্তর খুঁজিতে লাগিলেন।

ক্ষেন্তি বলিল - খেঁদির ওই সব কথা। খেদির মা তো ভারি পিঠে করে কি না। ক্ষিরের পূর দিয়ে ঘিয়ে ভাজলেই কি আর পিঠে হলো ? সেদিন জামাই এলে ওদের বাড়ী দেখতে গেলুম কিনা, তাই খুড়িমা দু'খানা পাটিসাপটা খেতে দিলে, ওমা কেমন একটা ধরা ধরা গন্ধ ... আর পিঠেতে কখনো কোনো গন্ধ পাওয়া যায় ? পাটিসাপটায় ক্ষীর দিলে ছাই খেতে হয়।

টিপ্পনী

বেপরোয়াভাবে উপরোক্ত উক্তি শেষ কিয়া ক্ষেন্তি মার চোখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল - মা, নারকোল কোরা একটু নেব ?

অন্নপূর্না বলিলেন - নে, কিন্তু এখানে ব'সে খাস নে। মুখ থেকে পড়বে না কি হবে, যা ঐদিকে যা।

ক্ষেন্তি নারকেলের মালায় একথাবা তুলিয়া লওয়া একটু দূরে গিয়া খাইতে লাগিল। মুখ যদি মনের দর্পন স্বরূপ হয়, তবে ক্ষেন্তির মুখ দেখিয়া সন্দেহের কোনো কারণ থাকিতে পারিত না যে, সে অত্যন্ত মানসিক তৃপ্তি অন্ভব করিতেছে।

ঘন্টাখানেক পরে অন্নপূর্ণা লিলেন - ওরে, তোরা সব এক টুকরো পাতা পেতে বোস তো দেখি, গরম গরম দিই। কএন্তি জল দেওয়া ভাত আছে ও বেলার, বার ক'রে নিয়ে আয়।

ক্ষেন্তির নিকট অন্নপূর্ণার এ প্রস্তাব যে খুব মনঃপুত হইল না, তাহা তার মুখ দেখিয়া বোঝা গেল। পুঁটি বলিল - মা, বড়দি পিঠেই খাক। ভালোবাসে৷ ভাত বরং থাকুক, আমরা কাল সকালে খাব।

খানকয়েক খাইবার পরেই মেজো মেয়ে পুঁটি খাইতে চাহিল না। সে নাকি অধিক মিষ্টি খাইতে পারে না। সকলের খাওয়া শেষ হইয়া গেলেও ক্ষেন্তি তখনও খাইতেছে। সে মুখ বুজিয়া শান্তভাবে খায়, বড় একটা কথা কহে না। অন্নপূর্ণা দেখিলেন, সে কম করিয়াও আঠারো উনিশখানা খাইয়াছে। জিজ্ঞাসা করিলেন - ক্ষেন্তি, আর নিবি ? ... ক্ষেন্তি খাইতে খাইতে শান্তভাবে সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িল। অন্নপূর্না তাহাকে আরও খানকয়েক দিলেন। কেচন্তির মুখ চোখ ঈষৎ উজ্জল দেখাইল, হাসিভরা আর দিকে চাহিয়া বলিল - বেশ খেতে হয়েছে, মা। ঐ যে তুমি কেমন ফেনিয়ে নাও, ওতেই কিন্তু .. সে পুনরায় খাইতে লাগিল।

অন্নপূর্ণা হাতা, খুন্তি, চুলা তুলিতে তুলিতে সস্নেহে তাঁর এই শান্ত নিরীহ একটু অধিক মাত্রেয় ভিজনপটু মেয়েটির দিকে চাহিয়া রহিলেন। মনে মনে ভাবিলেন - ক্ষেন্তি আমার যার ঘরে যাবে, তাদের শনেক সুখ দেবে ল এমন ভালোমানুষ, কাজে কর্মে বকো, মারো, গাল দাও, টু শব্দটি মুখে নেই। উঁচু কথা কখনো কেউ শোনেনি ...

বৈশাখ মাসের প্রথমে সহায়হরি এক দূর-সম্পর্কীয় আত্মীয়ের ঘটকালিতে ক্ষন্তির বিবাহ হইয়া গেল। দ্বিতীয় পক্সে বিবাহ জকরিলেও পাত্রটির বয়স চল্লিশের খুব বেশি কোনোমতেই হইবে না। তবুও প্রথমে এখানে অন্নপূর্না আদৌ ইচ্ছুক ছিলেন না, কিন্তু পাত্রটি সঙ্গতিসম্পন্ন, শহর শঞ্চলে বাড়ী, সিলেট চুন ও ইটের ব্যবসায় দু পয়সা নাকি করিয়াছে - এরকম পাত্র হঠাৎ মেলাও বড় দুর্ঘট কিনা।

জামাইয়ের বয়স একটু বেশি, প্রথমে অন্নপূর্ণা জামায়ের সম্মুখে বাহির হইতে একটু সঙ্কোচ করিতেছিলেন, পরে পাছে ক্ষেন্তির মনে কষ্ট হয় এই জন্য বরণের সময় তিনি ক্ষেন্তির সুপুষ্ট হস্তখানি ধরিয়া জামাইয়ের হাতে তুলিয়া দিলেন - চোখের জলে তাঁহার গলা বন্ধ হইয়া আসিল, কিছু বলিতে পারিলেন না।

বাড়ীর বাহির হইয়াই আমলকীতলায় বেহারারা সুবিধা করিয়া লইবার জন্য বরে পাল্কী একবার নামা্ইল। অন্নপূর্ণা চাহিয়া দেখিলেন, বেড়ার ধারের নীল রং এর মেদিফুলের গুচ্ছগুলি যেখানে নত হইয়া আছে, ক্ষেন্তির কম দামের বালুচরের রাঙা চেলীর বাহির হইয়া সেখানে লুটাইতেছে। ... তাঁর এই অত্যন্ত অগোছালো, নিতান্ত নিরীহ এবং একটু অধিক মাত্রায় ভোজনপটু মেয়েটিকে পরের ঘরে অপরিচিত মহলে পাঠাইতে তাঁর বুক উদ্বেল হইয়া উঠিতেছিল। ক্ষেন্তিকে কি অপরে ঠিক বুঝিবে? .....

যাইবার সময়ে ক্ষেন্তি চোখের জলে ভাসিতে ভাসিতে সান্তনার সুরে বলিয়াছিল - মা আষাঠ মাসেই আমাকে এনো ... বাবাকে পাঠিয়ে দিও - দু'টো মাস তো -

ও পাড়ায় ঠানদিদি বলিলেন - তোর বাবা তোর বাড়ী যাএ কেন রে, আগে নাতি হোক - তবে তো ...

ক্ষেন্তির মুখ লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিল। জলভরা দাগর চোখের উপর একটুখানি লাজুক আসির আভা মাখাইয়া সে একঘঁয়েমি সুরে বলিল - না, যাবে না বৈকি। ... দেখো তো কেমন না যান্।...

ফাল্গুন -চৈত্র মাসের বৈকালবেলা উঠানের মাচায় রৌদ্রে দেওয়া আমসত্ত্ব তুলিতে তুলিতে অন্নপূর্ণার মন হুহু করিত ... তাঁর অনাচারী লোভী মেয়েটি আজ বাড়ীতে নাই যে, কোথা হইতে বেড়াইয়া আসিয়া লজ্জাহীনার মতন হাতখানি পাতিয়া মিনতির সুরে অমনি বলিবে -মা, বলব একটা কথা? ঐ কোণটা ছিঁড়ে একটুখানি ...

এক বছরের উপর হইয়া ইয়াছে। পুনরায় আষাঢ় মাস। বর্ষা এশ নামিয়াছে। ঘরের দাওয়ায় বসিয়া তামাক সাজিতে সাজিতে বলিলেন - ও তুমি ধ'রে রাখ, ও রকম হবেই দাদা। আমাদের অবস্থার লোকের ওর চেয়ে ভাল কি আর জুটবে?

বিষ্ণু সরকার তালপাতার চাটাইয়ের উপর উবু হইয়া বসিয়াছিলেন, দুর হইতে দেখিলে মনে হইবার কথা, তিনি রুটি-করিবার জন্য ময়দা চটকাইতেছেন। গলা পরিষ্কার করিয়া বলিলেন - নাৎ, সব তো আর .... তা ছাড়া আমি যা দেব নগদই দেব। .... তোইমার মেয়েটির হয়েছিল কি?

টিপ্পনী

সহায়হরি হুঁকাটায় পাঁচ-ছটি টান দিয়া কাসিতে কাসিতে বলিলেন বসন্ত হয়েছিল শুনলাম। ব্যাপার বকি দাঁড়াল বুঝলে ? মেয়ে তো কিছুতেই পাঠাতে চায় না। আড়াইশো আন্দাজ টাকা বাকি ছিল, বললে, ও টাকা আগে দাও, তবে মেয়ে নিয়ে যাও।

- একেবারে চামার.....

- তারপর বললাম, টাকাটা ভায়া ক্রমে ক্রমে দিচ্ছি। পূজোর তত্ত্ব কম ক'রেও ত্রিশটে টাকার কম হবে না ভেবে দেখলাম কিনা ? মেয়ের নানা নিন্দে ওঠালো .... ছোটলোকের মেয়ের মতন চাল, হাভাতে ঘরের মত খায় ..... আরও কত কি। পৌষ মাসে দেখতে গেলাম, মেয়েটাকে ফেলে ধাকতে পারতেম না, বুঝলে?...

সহায়হরি হঠাৎ কথাবন্ধ করিয়া জোরে মিনিট কতক ধরিয়া হু'কায় টান দিতে লাগিলেন। কিছিক্ষন দু'জনের কোনো কথা শুনা গেল না।

অল্পক্ষণ পরে বিষ্ণু সরকার বলিলকেন - তারপর?

- আমার স্ত্রী অত্যন্ত কান্নাকটি করাতে পৌষমাসে দেখতে গেলাম। মেয়েটার যে অবস্থা করেছে। শাশুড়ীটা শুনিয়ে শুনিয়ে বলতে লাগল, না জেনে শুননে ছোটলোকের সঙ্গে কুটুম্বিতে করলেই এ রকম হয়, যেমনি মেয়ে তেমনি বাপ, পৌষমাসের দিনে মেয়ে দেখতে এলেন শুধু হাতে। পরে বিষ্ণু সরকারের দিকে চাহিয়া বলিলেন - বলি আমরা ছোট লোক কি বড় লোক, তোমারা তো সরকার খুঁড়ো জানতে বাকি নেই। বলি পরমেশ্বর চাতুয্যের নামে নীলকূঠির আমলে এ অঞ্চলে বাঘে গরুতে একঘাটে জল খেয়েছে - আজই না হয় আমি প্রাচীন ... । আভিজাত্যের গৌরবে সহায়হরি শুষ্কস্বরে হা হা করিয়া খানিকটা হাস্য করিলানে।

বিষ্ণু সরকার সমর্থনসূচক একটা অসওষ্ট শব্দ করিয়া বার কতক ঘাড় নাড়িলেন।

- তারপর ফাল্গুন মাসেই তার বসন্ত হলো। এমন চামার - বসন্ত গায়ে বেরুতেই টালায় আমার এক দূর-সম্পর্কের বোন আছে, একবার কালীঘাটে পূজো দিতে এসে তার খোঁজ পেয়েছিল - তারই ওখানে ফেলে রেখে গেল। আমায় না একটা সংবাদ না কিছু। তারা আমায় সংবাদ দেয়। তা আমি গিয়ে.....

- দেখতে পাইনি?

- নাঃ। এমনি চামার - গহনাগুলো অসুখ অবস্থাতেই গা থেকে খুলে নিয়ে তবে টালায় পাঠিয়ে দিয়েছে। .... যাক, তা চল যাওয়া যাক, বেলে গেল। .... চার কি ঠিক করলে ? .... পিঁপড়ে তোপে মুড়ির চার তো সুবিধে হবে না।...

তারপর কয়েক মাস কাটিয়া গিয়াছে। আজ আবার পৌষ-পার্বণের দিন। এবার পৌষমাসের শেষাশেষি এত শীত পড়িয়াছে যে, এরূপ শীত তাঁহারাকখনও জ্ঞানে দেখেন আই।

সন্ধ্যার সময় রন্নাঘরের মধ্যে বসিয়া অন্নপূর্ণা সরু চাক্‌লি পিঠের জন্য চালের গুঁড়ার গোলা তৈয়ারী করিতেছেন। পুটি ও রাধী উনুনের পাশে বসিয়আ আগুন পোহাইতেছে।

রাধী বললিতেছে - আর একটু জল দিতে হবে না, অত ঘন ক'রে ফেললে কেন?

পুঁটি লিল - আচ্ছা মে, ওতে একটু নুন দিলে হয় না?

- ওমা দেখ মা, রাধীর দোলাই কোথায় ঝুলছে, এখুনি ধরে উঠবে.....

অন্নপূর্ণা বলিয়া উঠিলেন - সরে এসে বোস না, আগুনের ঘাড়ে গিএ না বসলে কি আগুন পোয়ানো হয় না? এই দিকে আয়।

গোলা তৈয়ারী হইয়া গেল ... খোলা আগনে চড়াইয়া অন্নপূর্ণা গোলা ঢালিয়া মুচি দিয়া চাপিয়া ধরিলেন ... দেখিতে দেখিতে মিঠে আঁচে পিঠে টোপরের মতন ফুলিয়া উঠিল।

পুঁটি বলিল - মা, দাও, প্রথম পিঠেখানা কাঁনাচে ষাঁড়া - ষষ্টিকে ফেলে দিয়ে আসি।

অন্নর্পূর্ণা বলিলেন - একা যাস নে রাধীকে নিয়ে যা।

খুব জ্যোৎস্না উঠিয়াছিল, বাড়ীর পিছনে ষাঁড়া -গাছের ঝোপের মাথায় তেলাকুচা লতার থোলে থোলে সাদা ফুলেরমধ্যে জ্যোৎস্না আটকিয়া রহিয়াছে।

পুঁটি ও রাধী খিড়কী দোর খুলিতেই একটা শিয়াল শুকনো পাতায় খস্ খস্ শব্দ করিতে করিতে ঘন ঝোপের মাথায় ফেলিয়া দিল ল তাহার পর চারিধারের নির্জন বাঁশবনের নিস্তব্ধতায় ভয় পাইয়া ছেলেমানুষ পিছু হটিয়া আসিয়া খিড়কী-দরজার মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়া তাড়াতাড়ি দ্বার বন্ধ করিয়া দিল।....

পুঠটি ও রাধী ফিরিয়া আসিল অন্নপূর্ণা জিজ্ঞাসা করিলকেন - দিলি?

পুঁটি বলিল - হ্যাঁ মা, তুমি আর বছর যেখান একে নেবুর চারা তুলে এনেছিলে সেখানে ফেলে দিলেম ...

তারপ সে রাত্রে অনেকক্ষন কাটিয়া গেল। পিঠে গড়া প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে ... রাতওই তখন খুব বেশি। জ্যোৎস্নার আলোয় বনাড়ীর পিছনের বনে অনেকক্ষন ধরিয়া একটা কাঠঠোকরা পাখী ঠক্-র্-র্-র্ শব্দ করিতেছিল, তাহার স্বরটাও যেন ক্রমে তন্দআলু হইয়া

টিপ্পনী

টিপ্পনী

পড়িতেছে ... দুই বোনের খাইবার জন্য কলার পাতা চিরিতে চিরিতে পুঁটি অন্যমনস্কভাবে হঠাৎ বলিয়া উঠিল - দিদি বড় ভালোবাসত ....

তিনজনেই খানিকক্ষন নির্বাক হইয়া রহিল, তাহার পর তাহাদের তিনজনেরই দৃষ্টি কেমন করিয়া আপনা আপনি উঠানের এক কোণে আবদ্ধ হইয়া পড়িল ... সেখানে বাড়ীর সেই লোভী মেয়েটির লোভের স্মৃতি পাতায় পাতায় শিরায়-শিরায় জড়াইয়া তাহার কত সাধের নিজের হাতে পোঁতা পুঁই গাছটি মাচা জুড়িয়া বাড়িয়া উঠিয়াছে .... বর্ষার জল ও কার্তিক মাসের শিশির লইয়া কচি কচি সবুজ ডগাগুলি মাচাতে সব ধরে নাই, মাচা হইতে বাহিয় হইয়া দুলিতেছে ... সুপুষ্ট, নধর, প্রবর্ধমান জীবননের লাবণ্যে ভরপুর।

লেখক পরিচিতি : বিভূতিভূষন বন্দ্যোপাধ্যায় [১৮৯৪ - ১৯৫০]

জন্ম : মাতুলালয়ে নদীয়া জেলার কাঁচড়াপাড়ার কাছে ঘোষপাড়া মুরাতিপুরে। পৈত্রিক নিবাস ছিল ২৪ পরগনার বনগাঁ মহকুমার অন্তর্গত ব্যারকপুর নামক গ্রামে। পিতা মহানন্দ ও মাতা মৃনালিনীর জ্যেষ্ঠ সন্তান।

প্রথম পাঠ বাবার কাছে পরে পাঠশালায়, কলকাতায় আপার প্রাইমারী পাঠশালা। পঞ্চম শ্রেণীতে বনগ্রাম হাইস্কুল। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ন হয়ে রিপন কলেজে ভর্তি হন। ১৯১৬ - প্রথম বিভাগে আই.এ. পাশ, ১৯১৮ - ডিস্টিংশ্রন নিয়ে বি.এ পাশ. দর্শনশাস্তএ এম. এ ও 'ল' ক্লাসে ভর্তি। শিক্ষকতা দিয়েই কর্মজীবন শুরু।

সাহিত্যজীবন :

উপন্যাস : পথের পাঁচালী ১৯২৯, অপরাজিত ১৯৩২, আরন্যক ১৯৩৯, ইচ্ছামতী, প্রভৃতি। গল্পগ্রন্থ : মেঘমাল্লার (১৯৩১), মৌরীফুল (১৯৩২) কিন্নরদল (১৯৩৮), নবাগত, উপলখন্ড (১৯৪৪), বিধুমাষ্টার, মুখোশ ও মুখোশ্রী, রূপ হলুদ ছায়াছবি প্রভৃতি।

শিশুসাহিত্য : চাঁদের পাহাড়, মরণের ডঙ্কাবাজে, হীরামাণিক জ্বলে। ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দে ইচ্ছামতী উপ্যাসের জন্য তাকে মরনোত্তর রবীন্দ্র পুরস্কার প্রদান করা হয়। তার সৃষ্ট সাহিত্য বিশ্বসাহিত্যের সমকক্ষ।

কালজয়ী কথাসাহিত্যিক বিভূতিভূষন বন্দ্যোপাধ্যায় 'পথেরপাঁচালী' আরন্যক মত উপন্যাস নিয়ে সহিত্যের আসরে পদার্পন করলেন। কল্লোল কালিকলস যুগে নব্য লেখকদের প্রতিষ্ঠা। যৌবনের উন্মাদনা, মার্কস ও ফ্রয়েডিয় চেতনালোকের অভিঘাতে সমাজ দোদুল্যমান

। এমন এক সময়ে বিভূতিভূষন বন্দ্যোপাধ্যায় -

"শিশুর মতো কৌতুহল এবং কবির মতো কল্পনার প্রলেপ দিয়ে বিভূতিভূষণ অনুকরণিয় ভাষায় এমন গ্রামীন জীবনের চিত্র এঁকেছেন যে, চিত্র হিসেবে তা অনবদ্য এবং অনতিক্রমনীয়। দুঃখদারিদ্র্যের ছবি তিনি এঁকেছেন কিছু কিছু প্রমের চিত্রও এঁকেছেন, কিন্তু তাতে রোমান্টিক বৈচিত্র ও উত্তপ্ত কামনার চেয়ে স্নিগ্ধমধুর শান্ত ও গার্হস্থ্য রূপটি বেশি প্রকাশ পেয়েছে।" (অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত)।

বিভূতিভূষন প্রকৃতির নিবিড় অরন্যের মধ্যে যেমন আমাদের দু দন্ড শান্তি দিলেন, তেমণি সংসারে করুণ মধুর, দুঃখদারিদ্র্যের চিত্রটি ও তুলে ধরলেন তার অমর সৃষ্টি সম্ভারে।

পাঠপর্যালোচনা :

'পুঁইমাচা' গল্পটি দরদী কথাশিল্পী বিভূতিভূষনের ছোটগল্প মালার এক অনন্য সমাজ মনস্কতা মূলক গল্প। 'পুঁইমাচা' গল্পের নামকরনের মধ্যে গ্রমীন জীবন তার সংস্কার মানুষের বেঁচে থাকার জন্য জীবন সংগ্রাম জীবন সংগ্রাম, সুখ-দুঃখ-দারিদ্র্য সবই প্রকাশ পায়। বিভূতিভূষন সামান্য 'পুইমাচা' হলুদ রেখাযুক্ত পুঙইশাক কিভাবে গল্পের কেন্দ্র হয়ে উঠল এবং গল্পের বাস্তব সত্য। গল্পটির বিষয় হল এক গ্রামীন পরিবেশে সহায়হরি চাতুয্যে, স্ত্রী অন্নপূর্ণা চোদ্দ-পনের বছরের ক্ষেন্তি, পুটি ও রাধিকে নিয়ে সংসার। গ্রামের মোড়ল মাতম্বর তাদের নিদান। পনপথার দুঃসহ ফল কি হতে পারে তা গল্পে দেখানো হয়েছে।

সে সময়ে চোদ্দ-পনের বছর বয়স্ক মেয়ে বাড়িতে থাকা মানে সমাজের মানুষের কাছে ধিক্কার আর অপমান সহ্য করতে হয়। প্রথমে নিপাট গ্রামের ছবি আমাদের সামনে উঠে এসেছে - খড়ের ঘর, গ্রামীণ সংস্কার তেলমেখে কিছু না ছোঁয়া। উচ্চ সম্প্রদায়ের মানুষের দলে বাগদী দের পাড়ায় যাওয়া খুব একটা সম্মানের ছিল না। গ্রামীন সমাজে একঘরে করার একটা নিয়ম বহাল ছিল। এ সকল আলোচনা গ্রামের চন্ডীমন্ডপেই হোত। একঘরে মানুষের হাতে অন্যরা জল পর্যন্ত গ্রহণ করত না কেউ, সমাজের সকলল দিক থেকে তাদের প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে দেখা যায়। আশীর্বাদ হওয়া মেয়ের বিয়ে না হওয়া খুব অমঙ্গগলের এ ধারনা ছিল সমাজে প্রচলিত। ঘরের মেয়ের সময়ে বিয়ে না দিলে জাতমারা যায় এ দাওয়াআই মোড়লদের। এছাড়া চারিত্রিক অবনতির কথাও গল্পের মধ্যে বিভূতিভূষণ তুলে আনলেন।

গ্রামীন দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে জীবন চিত্রটি বড়ই মর্মস্পর্শী করেই এঁকেছেন কথা শিল্পী। স্ত্রীকন্যাদের নিয়ে হরির সংসার, সংসারের অভাব অনটন যে কত নির্মম হতে পারে তা আছে এই গল্পে। - গ্রাম্য দরিদ্র সংসারের সন্তান ক্ষেন্তি লোভ লালসা। পিতা সহায়হরির সঙ্গে

টিপ্পনী

টিপ্পনী

রিজপোতার বনে মেটে আলু চুরি, তার বিবাহ এবং মৃত্যুয এক করুন রসের সঞ্চার কররেছে। ক্ষেন্তি বড়ই লোভী, পুঁইশাক তার পছন্দের খাবার এই শাক জোগাড় করার পর তার মায়ের কাছ থাকে আসে তীব্রভৎসনা। কিন্তু তার প্রিয় এ খাবার থেকে তার মা বঞ্চিত করেনি। ছল ছল সরল দুটি চোখ তার মায়ে চোখ এড়িয়ে যায়নি, ফলে ফেলে আসা বোড়ো পুঁইশাক সযত্নে রান্না করে তুলে দিয়েছে সন্তানের মুখে। ক্ষেন্তি বাধা-মায়ের বড় আদরের তাই তার বিয়ে নিয়ে দুজনকেই চিন্তা করতে দেখি - 'ক্ষেন্তি আমার যার ঘরে যাবে তাদের অনেক সুখদেবে। এমন ভালোমানুষ, কাজ কর্মে বকো, মারো, গাল দাও, টু শব্দটি মুখে নেই। উঁচু কথা কখনো কেউ শোনেনি .....।' ক্ষেন্তির পুঁইশাকের প্রতি কতটা লোভ তা প্রকৃতি প্রমিক। মানুষের মর্মকথার সাহসী কথাশিল্পী বিভুতিভূষন তুলে ধরলেন 'পুইমাচা' গল্পে। ক্ষেন্তি পুইডাঁটার চারা, অন্যান্য মালমূলাদির চারা ও বাড়ির পাশে লাগিয়েছে, এ কান্ড দেখে প্রিয় কন্যাকে মা অন্নপূর্ণা বললে -

'দূর পাগলী, এখন পুঁই ডাঁটার চারা পোঁতে কখনো?'

অনাযাসে ক্ষেন্তি বলতে পারে -

'কেন, আমি রোজ জল ঢালব?"

দরিদ্র সহায়হরির কণ্যা ক্ষেন্তি এখন বড় হয়েছে পিতার সে দিকে নজর নেই। স্ত্রী অন্নপূর্না বার বার তার স্বামীকে এ নিয়ে খোঁটা দিলেও তার সশ্চিৎ ফেরেনি। এখন ক্ষেন্তি মখে লাবন্য সঞআর হয়েছে, স্বাস্থোন্নতি ও হয়েছে তাই পুরানো জামা আর তার গায়ে হয় না। পিতা শীতের জামা পরতে বললে, বাবাকে স্বান্তনা দেওয়ার জন্য বলতে হয় - 'আচ্ছা দিচ্ছি বাবা কই শীত, তেমন তো .....' এমন অভাবী সংসারে নতুন শীতবস্ত্র তো দিবাস্বপ্ন। হরিপুরের রাসমেলায় কেনা আড়াই টাকার কালো সার্জের এর বর্ণনা বিভূতিভূষনের বর্ণনায় - 'ছিড়িয়া যাইবার পর তাহাতে কতবার রিফু ইত্যাদি করা হইয়াছিল, সম্প্রতি গত বৎসর হইতে ক্ষেন্তির স্বাস্থ্যোন্নতিদরুণ জামাটি তাহার গায়ে হয় না।'

সংসারের এমন দারিদ্র্যের ছবি বিভূতিভূষন তাঁর ছোটগল্পো তুলে আনলেন। গ্রাম বাংলার এমন হতশ্রী অবস্থা যে ছিল তা জানতে পারা গেল পুঁইমাচা পাঠে। অসহায় দরিদ্র ব্রাহ্মণ সহায়হরি নিদারুন দারিদ্র্যে চুরির মতে কাজ করতে থাকে যা তার স্ত্রীকে পীড়া দেয়। সংসারে কর্তা হিসাবে তার তেমন সঙ্গতি দেখা যায় নি। কৃতকর্মের জন্য স্ত্রীর কাছে যে স্বপ্রতিভ হতে পারেনি, সন্তানের মুখে দু মুঠো ভাত যোগাতেতার হিমশিম খেতে হয়। এত দঃখ কাটেও তাকে স্বাভাবিক গৃহস্থের মত আচর করতে দেখা যায়। সহায়হরির দূর সম্পর্কের এক আত্মীয়ার ঘটকালিতে ক্ষেন্তির বিবাহ সম্পন্ন হল। এটি পাত্রটির দ্বিতীয়পক্ষের বিয়ে মা অন্নপূর্নার এ বিয়েতে সম্মত ছিল না।

ক্ষেন্তি লোভী সরল, মুখে উচ্চবাচ্য নেই। মা অন্নপূর্ণা মুখে যাই লুন না কেন। ক্ষেন্তিকে খুব ভালোবাসে। তাই আহার পটু মেয়েছে পরের বাড়ি পাঠাতে ভিতরে ভিতরে দুঃখ বোধ হচ্ছে কারণ ক্ষেন্তিকে সবাই বুঝতে পারবে না, জামাই বাড়ি পাঠানোর ক্ষেত্রে অন্নপূর্নার মনের অবস্থা -

"…. তাঁর এই অত্যন্ত অগোছালো, নিতান্ত নিরীহ এবং একটু অধিক মাত্রায় ভিজনপটু মেয়েটিকে পরের ঘরে অপরিচিত মহলে পাঠাইতে তাঁর বুক উদ্বেল হইয়া উঠতেছিল।'

ক্ষেন্তি চোখের জলে শ্বশুর বাড়ির পথে যাত্রার সময় মাকে বলেছিল আষাড় মাসেই বাবাকে পাঠানোর কথা। শুধু ঘর খালি হয়ে যায় নি, হৃদয় শূন্য করে সে যেন চলে গেল। বাড়িতে আমসত্ত্ব তৈরি হলে পিঠে-পুলি, পুঁইশাক রান্না হলে -

'অন্নপূর্ণার মন হুহু করিত ... তাঁর অনাচারী লোভী মেয়েটি আজ বাড়ীতে নাই যে, কোথা হিতে বেড়াইয়না আসিয়া লজ্জাহীনার মতন হাতখানি পাতিয়া মিনতির সুরে অমনি বলিএ - মা, বলব একটা কথা? ঐ কোনটা ছিঁড়ে একটুখানি.....'

এমন মা-মেয়ের সম্পর্ক, এমন আবদার এমন সারল্য কোথায় পাওয়া যাবে ? এতো শান্ত পল্লীবাংলার বাস্তবভূমি।

পণ প্রথা তখনো সমাজে ছিল ঘাঁটি গেড়ে। সহায় সম্বলহীন সহায়হরি এক সঙ্গে পনের টাকাটা দিতে পাএনি। কিন্তু তার জন্য ক্ষেন্তিকে কথা শুনতে হয় শ্বশুরবাড়িতে, শুধু এতে থেমে নেই মেয়েকে তার পিতার বাড়িতে পাঠাতে রাজি হয় নি। কারণ -

'আড়াইশো আন্দাজ টাকা বাকি ছিল, বললে ও টাকা আগে দাও তবে মেয়ে নিয়ে যাও।'

মানুষ যেন কেনা বেচার দ্রব্যে পরিণত হয়েছে। অসহায়ভাবে পণপ্রথার বলি খেষন্তি। নারীর প্রতি অবহেলা, কতটা নগ্ন হতে আরে তা খেন্তির মৃত্যুযর ঘটনাতে আমাদের সামনে চলে আসে। খেন্তির বসন্ত রোগ হলে শ্বশুরবাড়ীর লোকেরা সহায়হরির দূর সম্পর্কের বাড়িতে তাকে রেখে আসে। সহায়হরির বাড়িতে অর্থাৎ খেন্তির বাবাকে লোকেরা আরো কত নির্মম হতে পারে তা সহায়হরির কথায় -

'এমনি চামার - গহনাগুলো অসুখ অবস্থাতেই গা থেকে খুলে নিয়ে তবে টালায় পাঠিয়ে দিয়েছে।'

লোভ লালসা মানুষকে কত নীচে ননামাতে পারে তার প্রমাণ এটি, এখানে মানুষের

টিপ্পনী

টিপ্পনী

স্বাভাবিক মানবিকতা বোধ জাগতে দেখা যায় নি। একটি সন্তান বিবাহের পূর্ব পর্যন্ত পিতা-মাতার কাছে মানুষ হয় তাদের পরস্পরের হৃদয়ের সম্পর্ক খুব গভীর জালে আবদ্ধ, সেই প্রিয় সন্তানের মৃত্যুসংবাদ পিতা - মাতার কাছে হৃদয়বিদারী।

বিভুতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পুঁইমাচা' গল্পটিতে সমাজের গভীর ক্ষত যেমন আছে, তেমনি আমাদের জীবনের সম্পর্কের সহজ সরল দিকটি উঠে এসেছে। খেন্তি বাস্তবে না থেকে ও তার স্মৃতি কেমন করে বয়েচলেছেন, বিভূতিভূষনের দরদী লেখায় - 'সেখানে বাড়ীর সেই লোভী মেয়েটির লোভের স্মৃতি পাতায় পাতাব শিরায় শিরায় জড়াইয়া তাহার ককত সাধের নিজের হাতে পোঁতা পুঁই গাছটি মাচা জুড়িয়া বাড়িয়া উঠিয়াছে।' বাংলা দেশের অজস্র ক্ষেন্তি অকালে ঝরে গিয়ে ও আমাদের জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে পল্লবিত সঞ্জীবিত তারই কাহিনী 'পঁইমাচা'।

আদর্শ প্রশ্নাবলী :

ক. 'পুঁইমাচা' গল্পের নামকরণের সার্থকতা বিচার কর।

খ. 'পুঁইমাচা' গল্পের সমাজবাস্তবতার পরিচয় দাও।

গ. তৎকালীন রীতি-নীতি সংস্কার 'পুঁইমাচা' গল্পে প্রভাব ফেলেছে আলোচনা কর।

ঘ. সহায়হরির চরিত্রটি বিশ্লেষণ কর।

ঙ. লোভী ক্ষেন্তী চরিত্রটি বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অমরসৃষ্টি, চরিত্র অবলম্বনে বিচার কর।

চ. অন্নপূর্ণা চরিত্রটি অঙ্কননে লেখকের সার্থকতা বিচার কর।

ছ. 'একঘরে করবে গো, তোমাকে একঘরে করবে'- উপরিউক্ত উদ্ধৃতিটি কার রচনা ? কোথা থেকে নেওয়া হয়েছে ? কে, কাকে কথাগুলি বলেছেন ? আলোচনা কর।

জ. 'খাওয়ার নামে আর জ্ঞান থাকে না' - কে, কাকে কথাগুলি বলেছেন ? প্রসঙ্গ আলোচনা কর।

ঝ. 'তা সকালে উঠে জামাটা গায়ে দিতে তোর কি হয় ? দেখ দেকি, এই শীত ?'- কে , কাকে উদ্দেশ্য করে কথাগুলি বলেছেন ? গায়ে জামাটা না পরার প্রকৃত কারণ কী ?

ঞ. 'একে বারে চামার ...' - এ উক্তি কার ? কাদের সম্পর্কে করা হয়নেছে ? এমন কথা বলার কারণ কী ?

ট. 'তিনজনেই খানিক্ষন নির্বাক হইয়া বসিয়া রহিল,' - কাদের কথা বলা হয়েছে ? নির্বাক হওয়ার কারণ কি ?

লম্বকর্ণ

রাজশেখর বসু

টিপ্পনী

রায় বংশলোচন ব্যানার্জি বাহাদুর জমিন্দার অ্যান্ড অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট বেলেঘাটা বেঞ্চ প্রত্যহ বৈকালে খালের ধারে হাওয়া খাইতে যান। চল্লিশ পার হওয়া ইনি একটু মোটা হইয়া পড়িয়াছেন ; সেজন্য ডাক্তারের উপদেশে হাঁটিয়া এক্সারসাইজ করেন এবং ভাত ও লুচি বর্জন করিআ দু-বেলা কচুরি খাইয়া থাকেন।

কিছুক্ষন পায়চারি করিয়া বংশলোচনবাবু ক্লান্ত হইয়া খালের ধারে একটা ঢিপির উপর রুমাল বিছাইয়া বসিয়া পড়িলেন। ঘড়ি দেখিলেন - সাড়ে ছটা বাজিয়া গিয়াছে। জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ। সিলোন মনসুন পৌছিয়াছে এখানেও যে-কোনও দিন ঝড় জল হওয়া বিচিত্র নয়। বংশলোচন উঠিবা জন্য প্রস্তুত হইয়া হাতের বর্মাচুরুটে একবার জোরে টান দিলেন। এমন সময় বোধ হইল, কে যেন পিছু হইতে তাঁর জামার প্রান্ত ধরিয়া টানিতেছে এবং মিহি সুরে বলিতেছে - 'হুঁ হুঁ হুঁ হু২।' ফিরিয়া দেখিলেন একটি ছাগল।

বেশ হৃষ্টপুষ্ট ছাগল। কুচকুচে কালো নধর দেহ, বড় বড় লটপটে কানের উপর কচি পটলের মত শিং বাহির হইয়াছে। বয়স বেশী নয়, এখনও অজাতশত্রু। বংশলোচন বলিলেন - 'আরে এটা কোথা থেকে এল? কার পাঠা? কাকেও তো দেখছি না।'

ছাগল উত্তর দিল না। কেছে ঘেঁসিয়া লোলুপনেত্রে তাঁহাকে পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিল। বংশলোচন তাহার মাথায় ঠেলা দিয়া বলিলেন - 'যাঃ পালা, ভাগো হিঁয়াসে।' ছাগল পিছনের দু-পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া উঠিল, এবং সামনের দু-পা মুড়িয়া ঘাড় বাঁকাইয়া রায়-বাআদুরকে ঢুঁ মারিল।

রায়বাহাদুর কৌতুক বোধ করিলেন। ফের ঠেলা দিলাএন। ছাগল আবার খাড়া হইল এবং খপ করিয়া তাঁহার হাত চুরুটটি কাড়িয়া লইল। আহারান্তে বলিল - 'অর্ - র্-র্', অর্থাৎ আর আছে?

বংশলোচনের সিগার কেসে আর একটি মাত্র চুরুট ছিল। তিনি সেটি বাহির করিয়া দিলেন। ছাগলের মাথা-ঘোরা, গা-বমি বা অপর কোনও ভাব বৈলক্ষণ্য প্রকাশ পাইল না। দ্বিতীয় চুরুট নিঃশেষ করিয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল - 'অর্-র্-র্' ? বংশলোচন লিলেন - আর নেই। তুই এইবার যা। আমিও উঠি।'

টিপ্পনী

ছাগল বিশ্বাস করিল না, পকেট তল্লাস করিতে লগিল। বংশলোচন নিরুপায় হইয়া চামড়ার সিগার-কেসটি খুলিয়া ছাগলের সম্মুখে ধরিয়া লিলেন, - 'না বিশ্বাস হয়, এই দেখ বাপু।' ছাগল এক লম্ফে সিগার কেস কাড়িয়া লইয়া চর্বন আরম্ভ করিল। রায়বাহাদুর রাগিবেন কি হাসিবেন স্থির করিতে না পারিয়া বলিয়া ফেলিলেন -'শলালা'।

অন্ধকার হইয়া আসিতেছে। আর দেরী করা উচিৎ নয়। বংশলোলচন গৃহাভিমুখে চলিলেন। ছেগল কিন্তু তাঁহার সঙ্গ ছাড়িল না। বংশলোচন নবিব্রত হইলেন। ছাগল কি বৃত্তান্ত তিনি কিছুই জানেন না, নিকটে কোনও লোক নাই যে জিজ্ঞাসা কেরেন। ছাগলটাও নাছেড় বান্দা,তাড়াইলে যায় না। অগত্যা বাড়ি লইয়া যাওয়া ভিন্ন গত্যন্তর নাই। পথে যদি মালিকের সন্ধান পান ভালই, নতুবা কাল সকালে যা হো'ক একটা ব্যবস্থা করিবেন।

বাড়ি ফিরবার পথে বংশলোচন অনেক খোঁজ লইলেন, কিন্তু কেহই ছাগলের ইতিবৃত্ত বলিতে পারিল না। অবশেষে তিনি হতাশ হইয়া স্থির করিলেন আপাতত নিজেই উহাকেদ প্রতিপালন করিবেন।

হঠাৎ বংশলোচনের মনে একটা কাঁটা খচ করিয়া উঠিল। তাঁহার যে এখন পত্নীর সইত কলহ চলিতেছে। আজ পাঁচ দিন হইল কথা বন্ধ। ইহাদের দাম্পত্য কলহ বিনা আযম্বরে নিষ্পন্ন হয়। সামন্য একটা উপলক্ষ্য, দু-চারটি নাতিতীক্ষ্ণ বাক্যবাণ, তারপর দিন কতক অহিংস অস্যোগ, বাক্যালাপ বন্ধ, পরিশষে হঠাৎ একদিন সন্ধিস্থাপন ও পুনর্মিলন। এরকম প্রায়ই হয়, বিশেষ উদ্‌বেগের কারণ নাই। কিন্তু আপাতত অবস্থাটি সুবিধাজনক নয়৷ গৃহিণী জন্ত-জানোয়ার মোটেই পচ্ছন্দ করেন না। বংশলোচনের একবার কুকুর পোষার শখ হইয়াছিল, কিন্তু গৃহীনীর প্রবল আপত্তিতে তাহা সফল হয় নাই। আজ একে কলহ চলিতেছে তার উপর ছাগল লইয়া গেলে আর রক্ষা থাকিবে ননা, একে মনসা, তার ধুনার গন্ধ।

চলিতে চলিতে রায়বাহাদুর পত্নীর সহিত কাল্পনিক বাগ্‌যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন৷ একটা পাঁঠা পুষিবেন তাতে কার কি লিবার আছে ? তাঁর কি স্বাধীনভাবে একটা শখ মিটাইবার ক্ষমতা নাই ? তিনি একজন মান্যগণ্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, বেলেঘাটা রোড়ে তাঁহার প্রকান্ড অট্টালিকা, বিস্তর ভূসম্পত্তি। তিনি একজন খেতাবধারী অনারারি হাকিম, - পঞ্চাশ টাকা পর্যন্ত জরিমানা, এক মাস পর্যন্ত জেল দিতে পারেন। তাঁহার কিসের দুঃখ, কিসের লজ্জা, কিসের নারভেসনেস ? বংশলোচন বার বার মনকে প্রবোধ দিলেন - তিনি কাহারও তোয়াক্কা রাখেন না।

বংশলোচনবাবুর বৈঠকখানায় যে সান্ধ্য আড্ডা সে নিত্য বহুসংখ্যক রাজা উজির বধহইয়া থাকে। লাটসাহেব, সুরেন বাঁড়ুয্যে, মোহন বাগান, পরমার্থতত্ত্ব, প্রতিবেশী অধর বুড়োর শ্রাদ্ধ, আলিপুরের নূতন কুমিকর - কোন প্রসঙ্গই বাদ যায় না। সম্প্রতি সাত দিন ধরিআ বাঘের

বিষয় আলোচিত হইতেছিল। এইসূত্রে গতকল্য বংশলোচনের শ্যালক নগেন এবং দূর সম্পর্কের ভাগিনেয় উদয়ের মধ্যে হাতাহাতির উপক্রম হয়। অণ্যান্য সভ্য অনেক কষ্টে তাহাদিগকে নিরস্ত করেন।

টিপ্পনী

বংশলোচন বৈঠকখানা ঘরটি বেশ বড় ও সুসজ্জিওত ; অর্থাৎ অনেকগুলি ছবি, আয়না, আলমারি, চেয়ার, ইত্যাদি জিনিসপত্রে ভরতি। প্রথমেই নজরে পড়ে একটি কার্পেটে বোনা ছবি, কাল জমির উপর আসমানী রঙের বিড়াল। যুদ্ধের সময় বাজারে সাদা পশম ছিল না, সুতরাং ইদালটির এই দশা হইয়াছে। ছবির নীচে সর্বসাধারণের অবগতির জন্য বড় বড় ইংরেজী অক্ষরে লেখা CAT, তার নীচে রচয়িত্রীর নাম - মানিনী দেবী। ইনি গৃহকর্ত্রী। ঘরের অপর দিকের দেওয়ালে একটি রাধাকৃষ্ণের তৈলচিত্র। কৃষ্ণ রাধাকে লইয়া কদমতলায় দাঁড়াইয়া আচেন, একটি প্রকান্ড সাপ তাঁহাদিগকে পাক দিয়া পিসিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু রাধাকৃষ্ণের ভ্রুক্ষেপ নাই কারণ সাপটি বাস্তবিক সাপ নয়, ওঁকার মাত্র। তাছাড়া কতকগুলি মেমের চবি আছে, তাদের অঙ্গে সিল্কের ব্রাহ্মশাড়ি এবং মাধায় কাল সুতায় আলুলায়িত পরচুলা ময়দার কাই দিয়া আঁটিয়া দেওয়া হইয়াছে । কিন্তু ইহাতেও তাহাদের মুখের দুরন্ত মেম -মেমে ভাব ঢাকা পড়ে নাই, সেজন্য জোর করিয়া নাক বিঁধাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ঘরে দুটি দেওয়াল আলমারিতে চীনেমাটির পুতুল এবং কাচের খেলনা ঠাসা। উপরের শুইবার ঘরের চারিটি আলমারি বাঝাই ইয়া যাহা বাড়তি হইয়াছে তাহাই নীচে স্থান পাইয়াছে। ইহা ভিন্ন আরও নানাপ্রকার আসবাব, যথা - রাজা-রাণীর ছবি, রায়াহাদুরের পরিচিত ও অপরিচিত ছোট বড় সাহেবের ফটোগ্রাফ, গিলটিইর ফ্রেমে বাঁধানো আয়না, অ্যালম্যনক রঘড়ি, রায়বাহাদুরের সনদ, কয়েকটি অভিনন্দনপত্র ইত্যাদি আছে।

আজ যথা সময়ে আড্ডা বসিয়াএ। বংশলোচন এখনও বেড়াইয়া ফেরেন নাই। তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধু বিনোদ উকিকল ফরাসের উপর তাকিয়া ঠেস দিয়া খবরের কাগজ পড়িতেছেন। বৃদ্ধ কেদার চাতুজ্যে মহাশয় হুকা হাতে ঝিমাইতেছেন। নগেন ও উদয় অতি কষ্টে ক্রোধ রুদ্ধ করিয়া ওত পাতিয়া বসিয়া আছে, একটা ছুতা পাইলেই পরস্পরকে আক্রমণ করিবে।

আর চুপ করিয়া থাকিতে না পারিয়া উদয় বলিল - 'যাই বল, বাঘের মাপ কখনই ল্যাজ সুদ্ধ হ'তে পারে না। তা হলে মেড়েছেলেদের মাপও চুল সুদ্ধ হবে না কেন ? আমার বউ এর বিনুনিটাই তো তিন ফুট হবে। তবে কি বলতে চাও, বউ আট ফুট লম্বা ?

নগেন বলিল -'দেখ উদো, তোর বউ এর বর্ণনা আমরা মোটেই শুনতে চাই না। বাঘের কথা বলতে হয় বল।

চাটুজ্যে মহাশয়ের তন্দ্রা ছুটিয়া গেল। বলিলেন - 'আঃ হা, তোমাদের এখানে কি বাঘ

টিপ্পনী

ছাড়া অন্য জানোয়ার নেই?

এমন সময় বংশলোচন ছাগল লইয়া ফিরিলেন। বিনোদবাবুবলিলেন - 'বাহবা, বেশ পাঁঠাটি তো। কত দিয়ে কিনলে হে?

বংশলোচন সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিলেন। বিনোদ বলিলেন - 'বেওয়ারিস মাল, বেশীদিন ঘরে না রাখাই ভাল। সাবাড় করে ফেল - কাল রবিবার কআছে, লাগিয়ে দাও।'

চাতুজ্যে মশায় ছাগলের পেট টিপিবা বলিলেন - 'দিব্বি পুরুষ্টু পাঁঠা। খাসা কালিয়া হবে।'

নগেন ছাগলের উরু টিপিয়া লিল - উঁ উঁ হাঁড়িকাবা। একটু বেশী ক'রে আদ-বাটা আর প্যাঁজ।'

উদিয় বলিল - ' আমার বউ অ্যায়সা গুলিকাবাব করতে জানে।'

নগেন ভ্রুকুটি করিয়া বলিল -'উঁদো, আবার?'

বংশলোচন বিরক্ত হইয়া বলিলেন - 'তেমাদের কি জন্তু দেখলে খেতে ইচ্ছে করে? একটা নিরীহ অনাথ প্রাণী আশ্রয় নিয়েছে, তা কেবল কালিয়া আর কাবা।'

ছাগকলের সংবাদ শুনিয়া বংশলোচনের সপ্তমবর্ষীয়া কন্যা টেঁপী এবং সর্বকনিষ্ঠ পুত্র ঘেন্টু ছুটিয়া আসিল। ঘেন্টু বলিল - 'ও বাবা, আমি পাঁঠা খাব। পাঁঠায় ম - ম - ম -'

বংশলোচন বলিলেন - 'যা যাঃ,. শুনে শুনে কেবল খাই খাই শিখছেন।'

ঘেন্টু হাত প ছুঁড়িয়া বলিল - 'হ্যাঁ আমি ম-ম-ম-মেটলি খাব।'

টেঁপী বলিল - বাবা আমি পাঁটাকে পুষবো, একটু লাল ফিতে দাও না।'

বংশলোচন। বেশ তো একটু খাও - দাওয়া করুক তারপর খেলা করিস এখন।

টেঁপী। পাঁঠার নাম কি বল না?

বিনোদ বলিলেন - 'নামের ভাবননা কি? ভাসুরক, দধিমুখ, মসীপুচ্ছ, লম্বকর্ণ -'

চাটুজ্যে বলিলেন - 'লম্বকর্ণ ভাল।'

বংশলোচন কন্যাকে একটু অন্তরালে লইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন - টেপু, তোর মা

এখন কি করছে রে?

টেঁপী। এক্ষুণি তো কল-ঘরে গেছে।

বংশলোচন। ঠিক জানিস? তা হলে এখন এক ঘন্টা নিস্চিদ। দেখ, ঝিকে বল, চট্ করে ঘোড়ার ভেজানো ছোলা চাট্টি এনে এই বাইরের বারান্দায় যেন ছাগলটাকে খেতে দেয়। আর দেখ, বাড়ীর ভেতর নিয়ে যাস নি যেন।

মানিনী মুখ মুছিতে মুছিতে স্নানের ঘর হইতে বাহির হইয়া বলিলেন - 'আ মর, ওটাকে কে আনলে? দুর দুর - ও ঝি, ও বাতাসী, শীগগির ছাগলটাকে বার করে দে, ঝাঁটা মার।'

টেঁপী লিল - 'বারে, ওকে বাবা এনেছে, আমি পুষব।'

ঘেন্টু বলিল - 'ঘোড়া-ঘোড়া খেলব।'

মানিণী বলিলেন - 'খেলা বার ক'রে দিচ্ছি। ভদ্দর লোক আবার ছাগল পোষে। বেরো, বেরো - ও দরওয়ান, ও চুকন্দর সিং -

'হজৌর' বলিয়া চুকন্দর সিং হাজির হইল। শীর্ন খর্বকৃতি বৃদ্ধ গালপাট্টা দাড়ি, পাকালো গোঁপ, জাঁকালো গলা এবং ততোধিক জাঁকালো তার নাম - ইঁহারাই জোরে সে চোট্টা এবং দাকুর আক্রমণ হইতে দেইড়ি রক্ষা করে।

অন্দরের মধ্যে হট্টগোল শুনিয়া রায়বাহাদুর বুঝিলেন যুদ্ধ অনিবার্য। মনে মনে তাল ঠুকিয়া বাড়ির ভিতরে আসিলেন। গৃহিণী তাঁআর প্রতি দৃকপাত না করিয়া দারোয়ানকে বলিলেন - 'ছাগলটাকে আভি নেককা দেও, একদম ফটকের বাইরে। নেই তো এক্ষুনি ছিষ্টি নোংরা করেগা।'

চুকন্দর বলিল - 'বহুত আচ্ছা।'

বংশলোচন পাল্টা হুকুম দিলেন - 'দেখো চুকন্দর সিং, এই বকরি গেটের বাইরে যাগা তো তোমরা নোকরি ভি যাগা।'

চুকন্দর বলিল - 'বউত আচ্ছা।'

মানিনী স্বামীর প্রতি কয়েকটি অগ্নিময় নয়নবাণ হানিয়া বলিলেন - 'হ্যাঁলা টেঁপি হতচ্ছাড়ী, রাত্তির হয়ে গেল - গিলতে হবে না? থাকিস তুই ছাগল নিয়ে কাল যাচ্চি আমি হাটখোলায়'। হাটখোলায় গৃহিনীর পিত্রালয়।

টিপ্পনী

টিপ্পনী

বংশলোচন বলিলেন - 'টেঁপু, ঝিকে ব'লে দে বৈঠকখানাঘরে আমার শোবার বিছানা ক'রে দেবে। আমি সঁড়ি ভাঙতে পারি না। আর দেখ, ঠাকুরকে বল আমি মাংস খাব না। শুধু খানকতক কচুরি, একটু ডাল আর পটলভাজা।'

পুরাকালে বড়লোকদের বাড়িককে একটি করিয়া গোসাধার থাকিত । ক্রুদ্ধা আর্যনারীগণ সেখানে আশ্রয় লইতেন । কিন্তু আর্যপুত্রদের জন্য সে-রকম কোনও পাকা বন্দোবস্ত ছিল না, অগত্যা তাঁহার এক পত্নীর সহিত মতান্তর হইলে অপর এক পত্নীর দ্বারস্থ হইতেন। আজকাল খরচপত্র বাড়িয়া যাওয়ায় এই সকল সুন্দর প্রাচীন প্রথা লোপ পাইয়াছে ল এখন মেয়েদের ব্যবস্থা শুইবার ঘরের মেঝের উপর মাদুর অথবা তেমন তেমন হইলে বাপের বাড়ি। আর ভদ্রলোকদের একমাত্র আশ্রয় বৈঠকখানা।

আহারান্তে বংশলোচন বৈঠকখানা-ঘরে একাকী শয়ন করিলেন। অন্ধককারে তাঁর ঘুম হয় না, এজন্য রঘরের এক কোণে পিলসুজের উপর একটা রেড়িইর তেলে প্রদীপ জ্বালিলেন এবং একখানি গীতা লইয়া পড়িতে বসিলেন। এই গীতাটি তাঁর দুঃসময়েরর সম্বল, পত্নীর সহিত অসহযোগ হইলে তিনি এটি লইয়া নাড়াচাড়া করেন এবং সংসারের অনিত্যতা উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করেন। কর্মযোগ পড়িতে বংশলোচন ভাবিতে লাগিলেন - তিনি কী এমন অন্যায় কাজ করিয়াছেন যার জন্য মানিনী এরূপ ব্যবহার করেন ? আপের বাড়ী যাবেন - ইস, ভারি তেজ। তিনি ফিরাইয়া আনিবার নামটি করিবেন না, যখন গরজ হইবে আপনিই ফিরিবে। ঘৃহিণী শখ করিয়া যে-সব জঞ্জাল ঘরে পোরেন তা তো বংশলোচন নীরবে বরদাস্ত করেন। এই তো সেদিন পনরটা জলচৌকি, তেইশটা বঁটি এবং আড়াই শ টাকার খাগড়াই বাসন কেনা হইয়াছে, আর দোষ হইল কেবল ছাগলের বেলা ? হুঃ, যতে সব - । বংশলোচন গীতাখানি সরাইয়া রাখিবা আলোর সুইচ বন্ধ করিলেন এবং ক্ষনকাল পরে নাসিকাধ্বনি করিতে লাগিলেন।

লম্বকর্ণ বারান্দায় শুইয়া রোমন্থন করিতেছিল। দুইটা বর্মা চুরুট খাইয়া তাহার ঘুম চটিয়া গিয়াছে৷ রাত্রি একটা আন্দাজ জোরে হাওয়া উঠিল। ঠান্ডা লাগায় সে বিরক্ত হইয়া উঠিয়া পড়িল। বৈঠক-খানা ঘর হইতে মিটমিটে আলো দেখা যাইতেছে। লম্বর্ক্য তাহার বন্ধনরজ্জু চিবাইয়া কাটিয়া ফেলিল এবং দরজা খোলা পাইয়া নিঃশব্দে বৈঠকখানায় প্রবেশ করিল।

আবার তাহার ক্ষুধা পাইয়াছে। ঘরের চারিদিকে ঘুরিয়া একবার তদারক করিয়া লইল। ফরাশের এক কোণে একিগোছা খবরের কাগজ রহিয়াছে। চিবাইয়া দেখিল, অত্যন্ত নীরস। অগত্যা সে গীতার তিন অধ্যায় উদরস্থ করিল। গীতা খাইয়া গলা শুকাইয়া গেল ল একটা উঁচু তোপায়ার উপর এক কুঁজা জল আছে, কিন্তু তাহা নাগাল পাওয়া যায় না। লম্বকর্ণ তখন প্রদীপের কাছে গিয়া রেড়ির তেল চাখিয়না দেখিল, বেশ সুস্বাদু। চকচক করিয়া সবটা খাইল।

প্রদীপ নিবিল।

বংশলোচন স্বপ্ন দেখিতেছেন - সন্ধিস্থাপন হইয়া গিয়াছে। হঠাৎ পাশ ফিরিতে তাঁহার একটা নরম নরম স্পন্দনশীল স্পর্শ অনুভব হইল। নিদ্রাবিজড়িত স্বরে বলিলেন - 'কখন এলে'? উত্তর পাইলেন 'হুঁহু হু হু।'

হুলুস্থুল কান্ড। চোর চোর - বাঘ হ্যায় - এই চুকিন্দর সিং - জলদি আও - নগেন - উদো - শীগগীর আয় - মেরে ফেললে -

চুকন্দর তার মুঙ্গেরী বন্দুকে বারুদ ভরিতে লাগিল। নগেন ও উদয় লাঠি ছাতা টেনিস ব্যাট যা পাইল তাই লইয়া ছুটিল। মানিনী ব্যাকুল হইয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে নামিয়া আসিলেন। বংশলোচন ক্রমে প্রকৃতিস্থ হইলেন। লম্বকর্ণ দু-এক ঘা মার খাইয়া ব্যা ব্যা করিতে লাগিল। বংশলোচন ভাবিলেন, বাঘ বরঞ্চ ছিল ভাল। মানিনী ভাবিলেন, ঠিক হয়েছে।

ভোরবেলা বংশলোচন চুকন্দরকে পাড়ায় খোঁজ লইতে বলিলেন - কোনও ভালা আদমী ছাগল পুষিতে রাজী আছে কি না। যে-সে লোককে তিনি ছাগল দিবেন না। এমন লোক চাই যত্ন করিয়া প্রতিপালন করিবে, টাকার লোভে বেচিবে আ, মাংসের লোভে মারিবে না।

আটটা বাজিয়াছে। বংশলোচন বহির্বাটীর বারান্দায় চেয়ারে বসিয়া আছেন, নাপিত কামাইয়া দিতেছে। বিনোদবাবু ও নগেন অমৃতবাজারে ড্যালহাউসি ভার্সস মোহনবাগান পড়িতেছেন। উদয় ল্যাংড়া আমের দর করিতেছে। এমন সময় চুকন্দর আসিয়া সেলাম করিয়া বলিল - 'লাটুবাবু আয়ে হেঁ'। তিনজন সহচরের সহিত লাটুবাবু বারান্দায় আসিয়া নমস্কার করিলেন। তাঁহাদের প্রত্যেকর বেশভূষা প্রায় একই প্রকার - ঘাড়ের চুল আমূল ছাঁটা, মাথার উপর পর্বতাকার তেড়ি, রগের কাছে দু-গোছা চুল ফণা ধরিয়া আছে। হাতে রিস্ট-ওয়াচ, গায়ে আগুল ফলম্বিত পাতলা পাঞ্জাবি, তার ভিতর দিয়া গোলাপী গেঞ্জির আভা দেখা যাইতেছে। পায়ে লপেটা, কানে অর্ধদগ্ধ সিগারেত।

বংশলোচন বলিলাএন, -'আপনাদের কোত্থুকে আসা হচ্ছে।'

লাটুবাবু বলিলেন - আমরা বেলেঘাটা কেরোসিন ব্যান্ড। ব্যান্ড-মাস্টার লটবর লন্দী - অধীন। লোকে লাটুবাবুব'লে ডাকে। শুনলাম আপনি একটি পাঁঠা বিলিয়ে দেবেন, তাই সঠিক খবর লিতে এসেছি।'

বিনোদ বলিলেন, - 'আপনারা বুঝি কানেস্তারা বাজান?'

লাটু। কানেস্তারা কি মশায়? দস্তুরমত কলসাট। এই ইনি লবীন লিয়োগী ক্লারিয়নেট -

টিপ্পনী

টিপ্পনী

এই লরহরি লাগ ফুলোট - এই লবকুমার লন্দন ব্যায়ালা। তাছাড়া কর্লেট, পিকলু, হারমোনিয়াম, ঢোল, কত্তাল সব লিয়ে উলিশজন আছি। বর্মা অয়েল কোম্পানির ডিপোয় আমরা কাজ করি। ছোট সাহেবের সেদিন বে হ'ল ফিষ্টি দিলে, আমরা বাজালুম, সাহেব খুশী হয়ে টাইটিল দিলে - কেরোসিন বান্ড।

বংশলোচন। দেখুন আমার একটি ছাগল আছে, সেটি আপনাকে দিতে পারি, কিন্তু -

লাটু। আমরা হলুম উলিশটি প্রালী, একটা পাঁঠায় কি হবে মশায়? কি বল হে লরহরি?

রহরি। লস্যি, লস্যি।

বংশলোচন। আমি এই শর্তে দিতে পারি যে ছাগলিকে আপনি যত্ন ক'রে মানুষ করবেন, বেচতে পারবেন না, মারতে পারবেন না।

লাটু। এ যে আপনি লতুন কথা বলছেন মশায়। ভদ্দর লোকে কখনও ছাগল পোষে?

নরহরি। পাঁঠা লয় যে দুধ দেবে।

নবীন। পাখি লয় যে পড়বে।

নবকুমার। ভেড়া লয় যে কম্বল হবে।

বংশলোচন। সে যাই হোক। বাজে কথা বলবার আমার সময় নেই। নেবেন কি না বলুন।

লাটুবাবু ঘাড় চুলকাইতে লাগিলেন। নরহরি বলিলেন - 'লিয়ে লাও হে লাটুবাবু লিয়ে লাও। ভদ্দর নোক বলছেন অত করে।'

বংশলোচন। কিন্তু মনে থাকে যেন, বেচতে পারবে না, কাটতে পারবে আ।

লাটু। সে আপনি ভাববেন না। লাটু নন্দীর কথায় নড়চড় লেই।

লম্বকর্ণকে লইয়া বেলেঘাটা কেরোসিন ব্যান্ড চলিয়া গেল। বংশলোচন বিমর্ষচিত্তে বলিলেন - 'ব্যাটাদের দিয়ে ভরসা হচ্ছে না!' বিনোদ আশ্বাস দিয়ে বলিলেন - 'ভেবো না হে তোমার পাঁঠা গন্ধর্বলোকে বাস করবে। ফাঁকে পড়লুম আমরা।'

সন্ধ্যায় আড্ডা বসিয়াছে। আজও বাঘের গল্প চলিতেছে। চাটুজ্যে মহাশয় বলিতেছেন, 'সেটা তোমাদের ভুল ধারণা। বাঘ ব'লে একটা ভিন্ন জানোয়ার নেই ল ও একটা

অবস্থার ফের, আরসোলা হ'তে যেমন কাঁচপোকা। আজই তোমার ডারউইন শিখেছ - আমাদের ওসব ছেলেবেলা থেকেই জানা আছে। আমাদের রায়বাহাদুর ছাগলটা বিদেয় ক'রে খুব ভাল কাজ করেছেন। কেটে খেয়ে ফেলতেন তো কথা ছিল না, কিন্তু বাড়িতে রেখে বাড়তে দেওয়া - উঁহু।

বংশলোচন একখানি নূতন গীতা লইয়া নিবিষ্ট চিত্তে অধ্যয়ন করিতেছেন - নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ, অর্থাৎ কিনা, আত্মা একবার হইয়া আর যে হইবে না তা নয়। অজো নিত্যঃ - অজো কিনা ছাগলং। ছাগলটা যখন বিদায় হইয়াচে, তখন আজ সন্ধিস্থাপনা হইলো হইতে পারে।

বিনোদ বংশলোচনকে বলিলেন - 'হে কোস্তেয়, তুমি শ্রীভগবানকে একটু থামিয়ে রেখে চাটুজ্যে মশায়ের কথাটা শোন। মনে বল পাবে।'

উদয় বলিল - 'আমি সেবার সিমলেয় যাই -'

নগেন। মিছে কথা বলিস নি উদো ল তোর দোড় আমার জানা আছে, লিলুয়া অব্‌ধি।

উদয়। বাঃ আমার দাদশ্বশুর যে সিমলেয় থাকতরেন। বু তো সেই খানেই বড় হয়। তাই তো রং অত -

নগেন। খবরদার উদো।

চাটুজ্যে। যা বলছিলুম শোন। আমাদের মজিলপুরের চরণ ঘোষের এক ছাগল ছিল, তার নাম ভুটো। ব্যাটা খেয়ে হ'ল ইয়া লাশ, ইয়া শিং, ইয়া দাড়ি। একদিন চরণের বাড়ীতে ভোজ - লুচি, পাঁঠার কালিয়া, এইসব। আঁচবার সময় দেখি, ভুঁটো পাঁঠার মাংস খাচ্ছে। বললুম - দেখছ কি চরণ, এখুনি ছাগলটাকে বিদেয় করো - কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে গর কর, প্রাণে ভয় নেই ? চরণ শুনলো না ল গরিবের কথা বাসী হ'লে ফলে। তার পরদিন থেকে ভুটো নিরুদ্দেশ। খোঁজ - খোঁজ কোথা গেল। এক বছর পরে মশায় সেই ছাগল সোঁদরবনে পাওআ গেল। শিং নেই বললেই হয়, দাড়ি প্রায় খ'সে গেছে, মুখ একেবারে হাঁড়ি ; বর্ণ হয়েছে কাঁচা হলুদ, আর তার ওপর দেখা দিয়েছে মশায় - আঁজি আঁজি ডোরা-ডোরা। ডাকা হ'ল - ভুটে ভুটে। 'ভুটো বললে - আলুম। লোকজন দূর থেকে নমস্কার ক'রে ফিরে এল।

'লাটুবাবু আয়ে হৈঁ।'

সপারিষদ লাটুবাবু প্রবেশ করিলেন। লম্বকর্ণও সঙ্গে আছে। বিনোদ বলিলেন - 'কি ব্যান্ড-মাষ্টার, আবার কি মনে ক'রে ?

টিপ্পনী

টিপ্পনী

লাটুবাবুর আর সে লাবণ্য নাই। চুল উশক খুশক, চোখ বসিয়া গিয়াছে, জামা ছিড়িয়া গিয়াছে। সজল নয়নে হাঁউমাউ করিয়া বলিলেন - 'সর্বনাশ হয়েছে মশায় ধনে-প্রাণে মেরেছে। ও হোঃ হোঃ হোঃ।'

নরহরি বলিলেন - 'আঃ কি কর লাটুবাউ, একটু থির হও। হুজুর যখন রয়েছেন তখন একটা বিহিত করবেনই।

বংশলোচন ভীত হইয়া বলিলেন - 'কি হয়েছে - ব্যাপার কি?

লাটু । ঢোলোর চামড়া কেটেছে, ব্যায়ালার তাঁত খেয়েছে, হারমোনিবামের চাবি সমস্ত চিবিয়েছে। আর - আমার - পাঞ্জাবির পকেট কেটে লব্বই টাকার লোট - ও হো হো।

নরহরি। গিলে ফেলেছে। পাঁঠা নয় হুজুর, সাক্ষাৎ শয়তান। সবস্ব গেছে, লাটুর প্রাণটি কেবল আপনার ভরসায় এখনও ধুক-পুক করছে।

বংশলোচন। ফ্যাসাদে ফেললে দেখছি।

নরহরি। দোহাই হুজুর, লাট্টু দশাটা একবার দেখুন, একটা ব্যবস্থা ক'রে দিন - বেচারা মারা যায়।

বংশলোচন ভাবিয়া বলিলেন - 'একটা জোলাপ দিলে হয় না?'

লাট্টুবাবু উচ্ছসিত কণ্ঠে বলিলেন - 'মশায়, এই কি আপনার বিবেচনা হ'ল ? মরছি টাকার শোকে, আর আপনি বলছেন জোলাপ খেতে?

বংশলোচন। আরে তুমি খাবে কেন, ছাগলটাকে দিতে বলছি।

নরহরি । হায় হায়, হুজুর এখনও ছাগল চিনলেন না । কোন্ কালে হজম ক'রে ফেলেছে । লোট তো লোট - ব্যায়ালার তাঁত, ঢোলের চামড়া, হারমোনিয়ামের চাবি, মায় ইস্টিলের কত্তাল।

বিনোদ। লাট্টুবাবুর মাথাটা কেবল আস্ত রেখেছে।

বংশলোচন বলিলেন - 'যা হবার তা তো হয়েছে। এখন বিনোদ, তুমি একটা খেসারত ঠিক করে দাও। বেচারার লোকসান যাতে না হয়, আমার ওপর বেশী জুলুমও না হয়। ছাগলটা বাড়িতেই থাকুক. কাল যা হয় করা যাবে।'

অনেক দরদস্তুর পর একশ টাকায় রফা হইল। বংশলোচন বেশী কষাকষি করিতে

দিলেন না। লাট্টুবাবুর দল টাকা লইয়া চলিয়া গেল।

লম্বকর্ণ ফিরিয়াছে শুনিয়া টেঁপি ছুটিয়া আসিল। বিনোদ বলিলেন - 'ও টেঁপুরানী, শিগগির গিয়ে তোমার মাকে বলো কাল আমরে এখানে খাব - লুচি, পোলাও, মাংস -

টেঁপী। বাবা আর মাংস খায় না।

বিনোদ। বল কি ! হ্যাঁ হে বংশু, প্রেমটা এক পাঁঠা থেকে বিশ্ব-পাঠায় পৌঁচেছে না কি ? আচ্ছা তুমি না খাও, আমরা আচি। যাও তো টেঁপু মাকে বল সব যোগাড় করতে।

টেঁপী। সে এখন হচ্ছে না। মা-বাবার ঝগড়া চলছে, কথাটি নেই। বংশলোচন ধমক দিয়া বলিলেন - হ্যাঁ হাঁ - কথাটি নেই - তুই সব জানিস। যা যাঃ, ভারি জ্যাঠা হয়েছিস।'

টেঁপী। বা-রে আমি বুঝি এর পাই না ? তবে কেন মা খালি খালি আমাকে বলে - টেঁপী, পাখাটা মেরামত করতে হবে - টেঁপী, এ মাসে আরও দু-শ টাকা চাই। তোমাকে বলে না কেন ?

বংশলোচন। থাম্ থাম্ বকিস নি।

বিনোদ। হে রায়বাহাদুর, কন্যাকে বেশী ঘাঁটিও না , অনেক কথা ফাঁস করে দেবে। অবস্থাটা সঙ্গিন হয়েছে বল ?

বংশলোচন। আরে এতদিন তো সব মিটে যেত। ওই ছাগলটাই মুশকিল বাধালে।

বিনোদ। ব্যাটা ঘরভেদী বিভীষন। তোমারই বা অত মায়া কেন ? খেতে না পার বিদেয় ক'রে দাও। জলে বাস কর, কুমিরের সঙ্গে বিবাদ ক'রো না।

বংশলোচন দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া লিলেন - 'দেখি কাল যা হয় করা যাবে।

এ রাত্রিও বংশলোচন বৈঠকখানায় বিরহশয়নে যাপন করিলেন। ছাগলটা আস্তাবলে বাঁধা ছিল, উপদ্রব করিবার সুবিধা পায় নাই।

পরদিন বৈকাল সাড় পাঁচটার সময় বংশলোচন বেড়াইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া একবার এদিক-ওদিক চাহিয়া দেখিলেন, কেহ তাঁকে লক্ষ্য করিতেছে কিনা। গৃহিণী ও ছেলেমেয়েরা উপরে আচে। ঝি চাকর অন্দরে কাজকর্মে ব্যস্ত। চুকন্দর সিং তার ঘরে বসিয়া আটা সানিতেছে। লম্বকর্ণ আস্তাবলের কাছে বাঁধা আছে এ দড়ির সীমার মধ্যে আস্তে আস্তে লম্ফ ঝম্ফ করিতেছে। বংশলোচন দড়ি হাতে করিয়া ছাগল লইয়া আস্তে আস্তে বাহির হইলেন।

পাছে পরিচিত লোকের সঙ্গে দেখা হয় সেজন্য বংশলোচন সোজা রাস্তায় না গিয়া

টিপ্পনী

টিপ্পনী

গলি-ঘুঁজির ভিতর দিয়া চলিলেন। পথে এক ঠোঙা জিলিপি কিনিয়া পকেটে রাখিলেন। ক্রমে লোকালয় হইতে দূরে আসিয়া জনশূন্য খাল-ধারে পৌঁছিলেন।

আজ তিনি স্বহস্তে লম্বকর্ণকে বিসর্জন দিবেন, যেখানে পাইয়াছিলেন আবার সেইখানেই ছাড়িয়া দিবেন - যা থাকে তার কপালে। যথাস্থানে আসিয়া বংশলোচন জিলিপির টোঙাটি ছাগলকে খাইতে দিলেন। পকেট হইতে এক টুককরো কাগজ বাহির করিয়া তাহাতে লিখিলেন -

এই ছাগল বেলেঘাটা খালের ধারে কুড়াইয়া পাইয়াছিলাম, প্রতিপালন করিতে না পারায় আবার সেইখানেই ছাড়িয়া দিলাম। আল্লা কালী যিশুর দিব্য ইহাকে কেহ মারিবেন না।

লেখার পর কাগজ ভাঁজ করিয়া একটা ছোট টিনের কৌটায় ভরিয়া লম্বকর্ণের গলায় ভাল করিয়া বাঁধিয়া দলেন। তারপর বংশলোচন শেষবার ছাগলের গায়ে হাত বুলাইয়া আস্তে আস্তে সরিয়া পড়িলেন, লম্বকর্ণ তখন আহারে ব্যস্ত।

দূরে আসিয়াও বংশলোচন বার বার পিছু ফিরিয়া দেখিতে লাগিলেন। লম্বকর্ণ আহার শেষ করিয়া এদিক ওদিক চাহিতেছে। যদি তাঁহাকে দেখিয়া ফেলে এখনি পশ্চাদ্ধাবন করিবে। এদিকে আকাশের অবস্থাও ভাল নয়। বংশলোচন জোরে জোরে চলিতে লাগিলেন।

আর পারা যায় না, হাঁফ ধরিতেছে। পথের ধারে একটা তেঁতুল গাছের তলায় বংশলোচন বসিয়া পড়িলেন। লম্বকর্ণকে আর দেখা যায় না। এইবার তাঁহার মুক্তি - আর কিছুদিন দেরী করিলে জড়ভরতের অবস্থা হইত। ওই হতভাগা কৃষ্ণের জীবকে আশহরয় দিতে গিয়া তিনি নাকাল হইয়াছেন, গৃহীণী তাঁহার উপর মর্মান্তিক রুষ্ট, আত্মীয়স্বজন তাহাকে খাইবার জন্য হাঁ করিয়া আছে - তিনি একা কাঁহাতক সামালাইবেন ? হায় রে সত্যযুগ যখন শিবি রাজা শরণাগত কপোতের জন্য প্রাণ দিতে গিয়াছিলেন - মহিষীর ক্রোধ, সভাসদ্‌বর্গের বেয়াদবি, কিছুই তাঁহাকে ভোগ করিতে হয় নাই।

দ্রুম দুদ্দুড় দুড়ু দড়দড় ড় ! আকাশে কে ঢেঁটরা পিটিতেছে ? বংশলোচন চমকিত হইয়া উপরে চাহিয়া দেখিলেন, অন্তরীবক্ষের গম্বুজে এক পোঁচ সীসা রঙের অস্তর মাখাওয়া দিয়াছে। দূরে এক ঝাঁক সাদা বক জোরে পাখা চালাইয়া পালাইতেছে। সমস্ত চুপ - গাছের পাতাটি নড়িতেছে না। আসন্ন দুর্যোগের ভয়ে স্থাবর জঙ্গম হইয়া গিয়াছে। বংশলোচন উঠিলেন, কিন্তু আবার বসিয়া পড়িলেন। জোরে হাঁটার ফলে তাঁর বুক ধড়ফড় করিতেছিল।

সহসা আকাশ চিড় খাইয়া ফাটিয়া গেল। এক ঝলক বিদুৎ - কড় কড় কড়াৎ - ফাটা আকাশ আবার বেমালুম জুড়িয়া গেল। ঈশাণকোণ হইতে একটা ঝাপসা পর্দা তাড়া করিয়া

আসিতেছে। তাহার পিছনে যা-কিছু সমস্ত মুছিয়া গিয়াছে, সামনেও আর দেরি নাই। ওই এল, ওই এল ! গাছপালা শিহরিয়া উঠিল, লম্বা লম্বা তালগাছগুলা প্রবল বেগে মাথা নাড়িয়া আপত্তি জানাইল। কাকের দল আর্তনাদ করিয়া উড়িবার চেষ্টা করিল, কিন্তু ঝাপটা খাইয়া আবার গাছের ডাল আঁকড়াইয়া ধরিল। প্রচন্ড ঝড়, প্রচন্ডতর বৃষ্টি। যেন এই নগন্য উইটিবি - এই ক্ষুদ্র কলিকাতা শহরকে ডুবাইবার জন্য স্বর্গের তেত্রিশ কোটি দেবতা সার বাঁধিয়া বড় বড় ভৃঙ্গার হইতে তোড়ে জল ঢালিতেছেন। মোটা নিরেট জলধারা, তাহার ফাঁকে ফাঁকে ছোট ছোট ফোঁটা। সমস্ত শূন ভরাট হইয়া গিয়াছে।

মান ইজ্জত কাপড়-চোপড় সই গিয়াছে, প্রাণটা রক্ষা পাইলে হয়। হায় রে হতভাগা ছাগল, কি কুক্ষণে -

বংশলোচনের চোখের সামনে একটা উগ্র বেগনী আলো খেলিয়া গেল - সঙ্গে সঙ্গে আকাশের সঞ্চিত বিশ কোতি ভোল্ট এলেকট্রিসিটি অদূরবর্তী একটা নারিকেল গাছের ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া বিকনাদে ভূগর্ভে প্রবেশ করিল।

রাশি রাশি সরিষার ফুল। জগৎ লুপ্ত, তুমি নাই, আমি নাই। বংশলোচন সংজ্ঞা হারাইয়াছেন।

বৃষ্টি থামিয়াচে কিন্তু এখনো সোঁ সোঁ করিয়া হাওয়া চলিতেছে। ছেড়া মেঘের পর্দা ঠেলিয়া দেবতারা দু-চারটা মিটমিটে তারার লন্ঠন লইয়া নিচের অবস্থা তদারক করিতেছেন।

বংশলোচন কর্দম শয্যায় শুইয়া ধীরে ধীরে সংজ্ঞা লাভ করিলেন। তিনি কে ? রায়বাহাদুর। কোথায় ? খালের নিকট। ও কিসের শব্দ ? সোনা-ব্যাং। তাঁর নষ্ট স্মৃতি ফিরিয়া আসিয়াছে। ছাগলটা ? মানুষের স্বর কানে আসিতেছে। কে তাঁকে ডাকিতেছে ? 'মামা - জামাইবাবু বংশু আছ? - হুজৌর -'

অদূরে একটা ঘোড়ার গাড়ি দাঁড়াইয়া আছে। জনকতক লোক লন্ঠন লইয়া ইতস্তত ঘুরিতেছে এবং তাহাকে ডাকিতেছে। একটি পরিচিত নারীকন্ঠে ক্রন্দনধবনি উঠিল।

রায়বাহাদুর চাঙ্গা লইয়া বলিলেন - 'এই যে আমি এখানে আছি - ভয় নেই -'

মানিনী বলিলেন - 'আজ আর দোতালায় উঠে কাজ নেই। ও ঝি, এই বৈঠকখানা ঘরে বড় করে বিছানা করে দে তো। আর দেখ্, আমার বালিশটাও দিয়ে যা। আঃ চাটুজ্যে মিনসে নড়ে না। ও কি - সে হবে না - এই গরম লুচি ক-খানি খেতেই হবে, মাথা খাও। তোমার সেই বোতলটায় কি আছে - তাই একটু চায়ের সঙ্গে মিশিয়ে দেব নাকি ?

টিপ্পনী

টিপ্পনী

'হুঁহুঁহুঁহুঁ-'

বংশলোচন লাফাইয়া উঠিয়া বলিলেন - 'অ্যাঁ ওটা আবার এসেছে ? নিয়ে আয় তো লাঠিটা -'

মানিনী বলিলেন - 'আহা কর কি, মেরো না। ও বেচারা বৃষ্টি থামতেই ফিরে এসে তোমার খবর দিয়েছে। তাহাতেই তোমায় ফিরে পেলুম। ওঃ হরি মধুসুদন!'

লম্বকর্ণ বাড়ীতেই রহিয়া গেল, এবং দিন দিন শশিকলার ন্যায় বাড়িতে লাগিল। ক্রমে তাহার আধ হাত দাড়ি গজাইল। রায়বাহাদুর আর বড় একটা খোঁজ খবর করেন না, তিনি এখন ইলেকশন লইয়া ব্যস্ত। মানানী লম্বকর্ণের শিং কেমিক্যাল সোনা দিয়া বাঁধাইয়া দিয়াছেন। তাহার জন্য সাবান ও ফিনাইল ব্যবস্থা হইয়াছে, কিন্তু বিশেষ লাভ হয় নাই। লোকে দূর হইতে তাহাকে বিদ্রুপ করে। লম্বকর্ণ গম্ভীরভাবে সমস্ত শুনিয়া যায়, নিতান্ত বাড়াবাড়ি করিলে বলে - ব-ব-ব - অর্থাৎ বকিয়া যাও। আমি ও-সব গ্রাহ্য করি না।

লেখক পরিচিতি : পরশুরাম (রাজশেখর বসু) [১৮৮০ - ১৯৬০]

জন্ম : - বর্ধমান জেলার ব্রাহ্মণ পাড়া গ্রামে। পিতা চন্দ্রশেখর বসু, ভ্রাতা বিখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ গিরীন্দরশেখর বসু। পরশুরাম ছদ্মনাম তাঁর প্রকৃত নাম রাজশেখর বসু। রাজশেখর বসু রসায়ন শাস্রে এম. এ. এবং আইন পরীক্ষা ও দিয়েছেন।

কর্মজীবন : - বেঙ্গল কেমিক্যালস্ এর পরিচালক।

সাহিত্যচর্চা : - বাংলা সাহিত্যে হাস্যরসাত্মক গ্রন্থ রচনা করে নতুন ধারা আনলেন।

গ্রন্থ : - গড্ডলিকা - ১৯২৪, কজুলী - ১৯২৭, হনুমানে স্বপ্ন, লঘুগুরু, বিচিন্তা, এছাড়াও 'চন্ডালিকা' নামক বাংলা অভিধান রচনা করেন। রামায়ন, মহাভারত এর সংক্ষিপ্ত সংস্করণ, ভারতের খনিজ কুটিরশিল্প প্রভৃতি রচনা তার প্রকৃতিত্বের স্বাক্ষর।

১৯৪০ - কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কতৃক - 'জগত্তারিনী পদক' এবং ১৯৫৪ সালে 'সরোজিনী পদক' পান তিনি।

১৯৫৭-৫৮ সালে কলকাতা ও যাদবপুর থাকে ডি. লিট. সম্মানে ভূষিত হন।

১৯৫৫ সালে রবীন্দ্র পুরস্কার ল

১৯৫৮ সালে সাহিত্য আপকাদেমী পুরস্কার। এছাড়া ভারত সরকার তাঁকে 'পদ্মশ্রী'

উপাধিতে সম্মানিত করেন।

রাজশেখর বসু কলকাত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক বাংলা আনা-সংস্কার সমিতির সভাপতি পদে নিযুক্ত হন। ১৯৪৮ সালে সে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিভাষা সংসদের সভাপতি পদে আসীন হন।

টিপ্পনী

পাঠপর্যালোচনা :

রাজশেখর বসুর গল্পে আছে হাস্যরসের বাতাবরন, বৈঠকী মেজাজ, গল্পের চরিত্র তার মুখের সংলাপ, ভাষার প্রাজ্ঞলতা, শব্দচরনের দক্ষতা রাজশেখরের গল্পকে অন্য মাত্রাদান করেছে। লম্বকর্ণ গল্পটিও বৈঠকী চালের হাস্যমুখর শ্রণীর অন্তর্গত। গল্পটি পরশুরাম গ্রন্থাবলীর (১মম খন্ড) থেকে নেওয়া হয়েছে। শুরুতেই এক উচ্চ সম্ভ্রান্ত বংশীয় ভদ্রলোক রায় বংশলোচন ব্যানার্জী বাহাদুরের পরিচয় পাচ্ছি। বয়স চল্লিশোর্ধ, ডাক্তারের উপদেশ মত তিনি প্রতিদিন বিকালে খালের ধারে হেঁটে একসারসাইজ করেন। বংশলোচনবাবুর একটা নেশা আছে তিনি বার্মাচুরুট সেবন করেন। হাঁটতে যাওয়া সূত্রে একটা হৃষ্টপুষ্ট ছাগলের সঙ্গে তার দেখা ও ছাগল শুদ্ধ গৃহে প্রতাবর্তন। এই ছাগলইই 'লম্বকর্ণ' এ গল্পের কেন্দ্রীয় বিষয় হয়ে উঠেছে।

বংশলোচন বাবু একজন নামী হাকিম, কিন্তু স্ত্রী মানিনী দেবীকে সমীহ করে চলেন। মাঝে মধ্যে স্বামী স্ত্রীর সঙ্গে কলহের পরিবেশ তৈরি হয়, আবার চার - পাঁচদিন পরে তার অবসান ঘটে। মানিনীদেবী জীব জন্তু পচ্ছন্দ করেন না তাই বংশলোচনের কোন শখ কোনদিনই পূরণ হয়নি। বেলেঘাটা রোড়ের সুবিশাল বাড়িতে লোকলস্কর দাস-দাসীর অভাব নেই। প্রতিদিন সন্ধ্যায় বৈঠকখানার সহিত গৃহে সভা বসে। সে ঘরের সাজ দেখলে বনেদিয়ানার পরিচয় পাওয়া যায়। এমন এক পরিবেশ বংশমোচনের ছাগল সহ প্রবেশ সবাইয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। ছাগল নিয়ে বৈঠকে তখনই আলোচনার ঝড় ওঠে কেউ বলে বেওয়ারিস মাল, সাবাড় করে ফলাই ভাল , কেউ বলে খাসা কালিয়া হবে, কেই হাঁড়িকাবাব, এমন পরিবেশে সাত বছরের কন্যা টেঁপী ও ঘেন্টু এসে উপস্থিত। একজন পাঁঠা খাবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে আর একজন পোষার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। নামকরণের পরেই টেঁপী পিতার আদেশ ভুলে অন্দরমহলে লম্বকর্ণ কে নিয়া প্রবেশ করলে মানিনী বলেছে - 'আ মর, ওটাকে কে আনলে ? দুর দুর - ও ঝি, ও বাতাসি, শীগগির ছাগলটাকে বার করে দে, ঝাঁটা মার।' এমন হট্টগোলের সংবাদ পেয়ে বংশলোচন বুঝতে পেরেছেন যে ছাগল নিয়ে যুদ্ধ অনিবার্য। এ নিয়ে স্বামীর স্ত্রীর মধ্যে বিরোধ কথা ও বন্ধ টেঁপী ও ঘন্টুর মধ্য দিয়ে তাদের কথোপকথোন চলে। মানিনী পিত্রালয় হাটখোলায় যাবার কথা বলে অপর দিকে বংশলোচন বৈঠক খানানর ঘরেই শুয়ে পড়লেন। স্ত্রীর সঙ্গে এমন বিরোধ উপস্থিত হলে গীতা সম্বল করে সংসারের অনিত্যতা উপলব্ধির চেষ্ঠা দেখা যায়।

টিপ্পনী

লম্বকর্ণকে নিয়ে বংশলোচনের আবার নতুন উৎপাত সইতে হচ্ছে। বংশলোচনের উৎপাতে সবাই অতিষ্ট তাকে বিদায় দেবার চেষ্টা করলেও নানা কারণে ফিরে এসেছে। অবশেষে এই লম্বকর্ণই সমস্ত বিরোধের সমাধান করে দিয়েছে।

একদিন বংশলোচন এই লম্বকর্ণকে বিদায় দেবার জন্য যেখানে তাকে পেয়েছিল সেখানেই জিলাপির ঠোঙা হাতে করে নিয়া উপস্থিত হল। তারপর এক টুকরো কাগজে লম্বকর্ণ কে না মারার কথা লিখে কৌটায় ভরে গলায় ঝুলিয়ে দিলেন। জিলাপি খেতে দিয়ে সুযোগ বুঝে বংশলোচন সেখান থেকলে বাড়ির পথে পা বাড়িয়েছে। বিদ্যুৎগর্ভ মেঘ ও বৃষ্টিতে বাড়িতে পৌছানো সম্ভব হয় নি তার বজ্রাঘাতে জ্ঞান হারালেন তিনি। কিন্তু লম্বকর্ণ বৃষ্টি থামতে বাড়ি পৌঁছে বংশলোচনের সংবাদ দিয়েছে। একথা সুস্থ হয়ে ওঠা মানিনী বংশলোচনকে বলেছে। বংশলোচন ছাগলের হুঁ হুঁ শব্দ পাওয়া মাত্র লাঠি আনার নির্দেশ দিয়েছে তখন মানানী বলে ওঠং - 'আহা করকি, মেরো না।' এই লম্বকর্ণ তাদের মান ভঞ্জন ঘটিয়েছে প্রাণ বাঁচিয়েছে প্রভু বংশলোচনের। হাস্যরসে যতই শ্লেষ থাকনা কেন তা বাবু সমাজের রূপটিকে যেমন তিলে ধরেছে, তেমনি সংসারের মনে অভিমান বিষয়টি ও স্মিত হাস্যের সঙ্গে তুলে ধরলেন।

পরশুরামের গল্পে নানা অসঙ্গতি বৈঠকী মেজাজে তুলে ধরলেন। বিরিঞ্চিবাবা, ডমরুচরিত, কচি সংসদ, উলটপুরাণ গল্পের মতো লম্বকর্ণ ও সমাজের অসঙ্গতি নিয়ে রস সৃষ্টি করেছেন। হাসির গল্প সম্পর্কে জনৈক সমালোচকের মন্তব্য -

'হাসির উৎসে তাঁর গল্প শুলের জন্মম হলেও তার নিচে ছিল অশ্রুর ঝরন।'

রাজশেখর বসুর গল্পে হাসি প্রধান বিষয় লম্বকর্ণ ও তা দেখতে পাই শুরুতেই ছাগলের হুঁ হুঁ শব্দ, রায় বাহাদুরকে টুঁমারা সিগারেট খাওয়া হাসির উপাদান হয়ে উঠেছে। ছাগলকে নিয়ে গৃহে ফিরলে বৈঠকখানায় হাস্য কৌতুক জমে উঠেছে। নিত্য বৈঠককানায় আড্ডার আসর এখানে রাজা উজির বধ, মোহনবাগান, পরমার্থতত্ত্ব, অমুকের শ্রাদ্ধ, কুমিকর - বাঘের প্রসঙ্গ আদ যায় না। কখনো কখনো -'সম্প্রতি সাতদিন ধরিয়া বাঘের বিষয়ন আলোচিত হইতেছিল।' এসকল বিষয় নিয়ে হাতাহাতির উপক্রম ও দেখা যায়। বাঘের মাপ কোথা থাকে হবে সেখানে ল্যাজ সুদ্ধ হবে কিনা সংশয় এমন পরিবেশে উদয় বলে ওঠে - 'তো হলে মেয়েছেলেদের মাপ ও চুল সুদ্ধ হবে না কেন? আমার বউ এর বিনুনিটাই তো তিনফুট হবে। তবে কি বলতে চাও, বউ আটফুট লম্বা?' এমন ভাবেও বৈঠকী মেজাজে গল্পটিকে হাস্যমুখর করেছেন রাজশেখর।

গল্পে পাঁঠার নামকরণ ও বেশ মুখোরোচক যেমন - 'বিনোদ বলিলেন - 'নামের ভাবনা কী / ভাসুরক, দধিমুখ, মসীপুচ্ছ, লম্বকর্ণ -'

চাটুজ্যে বলিলেন - লম্বকর্ণই ভাল।' এছাড়া প্রতিটি মানুষের নামকরণ ও আমাদের হৃদয়ে হাসির সঞ্চার করে যেমন - টেঁপী, ঘন্টু, বাতাসী, চুকন্দর, লাটু, বংশলোচন প্রমুখ। লাটু এবং অন্যান্যদের আগমন বেশভূষা ও বেশ উদ্ভট বাবু গোষ্ঠীভুক্ত। তিনজন আগন্তুকের বর্ণনা -

'তাঁহাদের প্রত্যেকের বেশভুষা প্রায় একই প্রকার - ঘাড়ের চুল আমূল ছাঁটা, মাথার উপর পর্বতেকার তেড়ি,রগের কাছে দু-গোছা চুল ফনা ধরিয়া আছে। হাতে রিস্ট-ওয়াচ, গায়ে আগুল ফলমইত পাতলা পাঞ্জাবি, তার ভিতর দিয়া গোলাপী গেঞ্জির আভা দেখা যাইতেছে। পায়ে লপেটা, কানে অর্ধদগ্ধ সিগারেট।'

এযেন বঙ্কিমচন্দ্র বর্ণিত আবু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি। তাদের বিলাশ ব্যসন ভোজন রিচির প্রতি কটাক্ষপাত করেছেন বিদ্রুপের সঙ্গে।

রাজশেখরের হাসির মধ্যে এ অশ্রু ছিল তাও আমরা প্রত্যক্ষ করি। বাবু গোছের লটুর পকেট যখন কেটেছে লম্বকর্ণ তখন বংশলোচনের কাছে তার উপদ্রবের বলতে এসেছে, হাস্যরসের ছবি আঁকলেন লেখক -

'লাট্টু ঢোলের চামড়া কেটেছে, ব্যায়লার তাঁত খেয়েছে, হারমোনিয়ামের চাবি সমস্ত চিবিয়েছে। আর আমার পাঞ্জাবীর পকেট কেটে লব্বই টাকার লোট - ও হো হো।

আবার লাটু যখন অসহায় নরহরি তার হয়ে ব্যবস্থা করে দেবার জন্য বলেছে - 'বেচারা মারা যায়।' উত্তরে বংশলোচন - 'একটা জোলাপ দিলে হয় না?'

একদিকে টাকার শোক অন্যদিকে বঙশমোচনের জোলাপ দেওয়ার কথায় হাস্যরসের জাগরন ঘটে।

রাজশেখর বসু চরিত্রের মুখে এমন ভাষা বসিয়েছেন যে তা পরিহাস মুখর হয়ে উঠেছে। বিদ্‌ঘুটে বেশভুষা যুক্ত লাতুর মুখের ভাষা - 'কানেস্তারা কি মশায়? দস্তুরমত কলসাট। এই ইনি লবীন লিয়োগী ক্লারিয়নেট এই লরহরি লাগ ফুলেট - এই লবকুমার লন্দন বেয়ালা। তাছাড়া কর্লেট, পিকলু, হারমোনিয়া, ঢোল, কত্তাল সব লিয়ে উলিশজন আছি ল।'

বাংলা বুলির পাশাপাশি হিন্দি বুলি বেশ হাস্যকর হয়ে উঠেছে। মানানী, দারোয়ান চুকন্দর কে বলল - 'ছাগলটাকে আভি নিকাল দেও, একদম ফটকের বাইরে। নেই তো এক্ষুনি ছিষ্টি নোংরা করেগা।' চুকন্দর - 'বহুত আচ্ছা।'

এমনই রাজশেখর সু নির্মোহ দৃষ্টি নিয়ে তার রস রচনা করলেন। হাস্যরস সৃষ্টি জকন্যই তিনি 'লম্বকর্ণ' নামটি বেছে নিলেন এবং হাসির মধ্যে আনলেন শ্লেষ, বিদ্রুপ ও করুণ রসের

টিপ্পনী

স্রোত। বৈঠকী আড্ডার মেজাজে তিনি লম্বকর্ণ গল্পটি রচনা করলেন।

টিপ্পনী

আদর্শ প্রশ্নমালা :

ক. আড্ডা সহিত হিসাবে 'লম্বকর্ণ' গল্পটি কতটা সার্থক আলোচনা কর।

খ. হাস্যরস সৃষ্টিই পরশুরামের মূল উদ্দেশ্য ছিল লম্বকর্ণ গল্প অবলম্বনে তা আলোচনা কর।

গ. 'আজ পাঁচদিন হইল কথা বন্ধ, ইঁহাদের দাম্পত্য কলহ বিনা আড়ম্বরে ইষ্পন্ন হয়।' - উদ্ধৃতিটি কোথা থেকে নেওয়া হয়েছে? কাদের দাম্পত্যের কথা এখানে বলা হয়েছে।

ঘ. আজকাল খরচপত্র বাড়িয়া যাওয়ায় এই সকল সুন্দর প্রাচীন প্রথা লোপ পাইয়াছে।'' - কোন প্রথার কথা বলা হয়েছে? লেখক এমন প্রসঙ্গ আনলেন কেন তা আলোচনা কর।

ঙ. আপনাদের কোত্থেকে আসা হচ্ছে।' - কে কাদের এ প্রশ্ন করেছেন ? তাদের সম্পর্কে যা জান নিজের ভাষায় লেখ।

চ. 'লম্বকর্ণ নামকরণের যথার্থ্যতা বিচার কর।

ছ. বংশলোচন চরিত্র বিশ্লেষণ কর।

জ. মানিনী চরিত্র সৃষ্টির সার্থকতা বিচার কর।

ঝ. 'আল্লা কালী যিশুর দিব্য ইহাকে কেহ মারিবেন না।' - কে, কার সম্পর্কে একথা বলেছেন ? এমন বলার কারণ কি জানাও।

ঞ. 'লম্বকর্ণ্য' বাড়ীতেই রহিয়া গেল ? - কে এই 'লম্বকর্ণ' সংক্ষেপে তার থেকে যাওয়ার কারণ কি পর্যালোচনা কর।

চতুর্থ একক : পরিভাষা

টিপ্পনী

উচ্চতর বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে পরিভাষা আবশ্যিক। যে কোন ভাষায় দর্শন-সাহিত্যতত্ত্ব - সমাজবিদ্যা - বিজ্ঞান প্রভৃতি লেখাপড়ার ক্ষেত্রে পরিভাষা নিয়ে সমস্যার সম্মুখীন পড়তে হয় আমাদের। বাংলা ভাষায় পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ও চর্চার ক্ষেত্রে ও এই সমস্যা বর্তমান। মাতৃভাষায় সর্বজনীন শিক্ষা ও বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে পরিভাষা তৈরির কাজ হত অসুবিধা থাকুক না কেন করতেই হবে। 'পরিভাষা' সম্পর্কে ধারনা দিতে গিয়ে ড. সুরভি বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন - 'পরিভাষা কাকে বলে ? সহজ কথায় বলা যায়, কোন বিষয় বা বিদ্যার নিজস্ব ভাষারই আর এক নাম 'পরিভাষা', মূর্ত্ত বা বিমূর্ত্ত যাই হোক না কেন, যে কোন ধারনা, কার্য, চিন্তা বা মতবাদের একটি নিজস্বঅভিধা থাকে। বলা বাহুল্য, এই নিজস্ব অভিধা সেই বিশেষ বিদ্যা বা বিষয়ের প্রসঙ্গ বা Context উদ্ভুত। অর্থাৎ পরিভাষা বা পারিভাষিক প্রতিশব্দ সর্বদাই প্রাসঙ্গিক বিদ্যা বা শৃঙ্খলার অনুসঙ্গ সম্পৃক্ত হয়।"

একটু সচেতন অবলোকনে বুঝতে পারি সমগ্র বিশ্বের জ্ঞান - বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্র ও পরিধির বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে এই পরিভাষা কত অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। বিশেষ করে ইংরেজি সহ বিদেশী ভাষার পারিভাষিক শব্দ গুলি গুরুত্বের সঙ্গে সৃষ্টি কলরতে হে। ভাষা যেহেতু চলমান তা সচল ধারায় এগিয়ে চলবে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তাল মেলাতে হবে। যেমন - Beauty - শৌন্দর্য, Imitation - অনুকরণ, Method- পদ্ধতি, Lifestyle - জীবনশৈলী প্রভৃতি পরিভাষা তৈরির জন্য সাবধানতা ও তার উৎস, বিষয় সম্পৃক্তা সম্পর্কে জ্ঞান থাকা আবশ্যিক।

পরিভাষা সংক্রান্ত আলোচনা স্বাধীনতা উত্তর কালে রাজশেখর বসুর সভাপতিত্বে ও সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র মজুমদার, সজনীকান্ত দাস প্রমুখ সদস্যের সমবয়ে গঠিত হল 'পরিভাষা সংসদ'। ১৯৪৮ সালে সরকারি কাজের প্রয়োজনে তা শৃষ্টি হয়েছিল। ১৯৬১ তে সুনীতী কুমারের সভাপতিত্বে নতুন করে পরিভাষা সংসদ গঠিত হল। ১৯৯৩ সালে পশ্চমবঙ্গ বাংলা আকাদেমী পরিভাষা সংকলন 'প্রশাসন' প্রকাশ করে। ১৯৮৪ - ৮৫ বাংলাদেশের বাংলা আকাদেমি দর্শন পরিভাষা কোষ, সাহিত্য সমালোচনা ও নন্দন তত্ত্ব পরিভাষা, শিক্ষা পরিভাষা প্রকাশ করে। তবে সবাই পরিভাষাকে চূড়ান্ত যথার্থ পরিভাষা কোষ বলে মনে করেন না, সময়ের সঙ্গে এর গ্রহণযোগ্য তার উপর পরিভাষা গুরুত্ব নির্ভরশীল।

টিপ্পনী

নিম্নে ৬০ টি পরিভাষা সংকলিত হল :

A	
Abstract	সার, বিমূর্ত, বস্তুনিরপেক্ষ
Accident-prone	দুর্ঘটনাপ্রবণ
Adaption	অভিযোজন, সাআঙ্গীকরণ গ্রহণ
Adjourned sine die	অনির্দিষ্টকাল পর্যন্ত স্থগিত
Aesthetice	নন্দনতত্ত্ব, সৌন্দর্যতত্ত্ব, কাব্যজিজ্ঞাস
Agronomy	কৃষিবিদ্যা
Amendment	সংশোধন
Article	অনুচ্ছেদ
Audio-visual aid	শ্রাব্য-দৃশ্য অবলম্বন
Auditor-General	মহানিরীক্ষক
B	
Basic pay	মূল বেতন
Benefit of doubt	সন্দেহবকাশ
Bourgeois	পরশ্রমজীবী, পরিশ্রমভোগী
Broadcasting	সম্প্রচারণ
C	
Capital expenditure	মুখ্যব্যায়
Catharsis	বিশোধন, মোক্ষণ, উপশম
Chauvinism	জাত্যভিমান, উগ্র-স্বাদেশিকতা
Charge Sheet	অভিযোগপত্র
Chorus	সম্মোলক সঙ্গীত
Coalition Government	যৌথ সরকার, মিলিজুলি সরকার
Columnist	স্তম্ভকার, সংবাদভাষ্যকার, কলমচি
D	
Dehydration	জলবিয়োজন
Director	অধিকর্তা

G	
Grant	অনুদান, মঞ্জুরি
H	
Horticulture	উদ্যানপালন
I	
Immigration	অভিবাসন
Infrastructure	পরিকাঠামো
J	
Jurisdiction	অধিকারক্ষেত্র, একতিয়ার
L	
Lexicon	অভিধান
Lingua-francea	মিশ্রভাষা
M	
Mysticism	অতীন্দ্রিয়তা, অতীন্দ্রয়বাদ
Mythology	পুরাবৃত্ত
N	
Nihilism	অবিশ্বাসবাদ
Note of Dissent	ভিন্ন মন্তব্য
O	
Occidental	পাশ্চাত্য, পাশ্চাত্য জগতের লোক
P	
Pastoral poetry	রাখালী কবিতা, গোষ্ঠীগীতি
Plebisctie	গনভোট
Power of Attorney	মোক্তারনামা
Pseudonym	ছদ্মনাম
R	
Recurring Expenditure	আবর্তক ব্যায়
Remote Control	দুর-নিয়ন্তণ
S	
Sovereignly	সার্বভোমিকতা, সার্বভৌমত্ব
Stream of consciousness	চেতনাপ্রবাহ

টিপ্পনী

Surrealism	অতিবাস্বতা, পরাবাস্তবতা
]Symbolist	প্রতীকবাদী
Symphony	একতান, ধ্বনিসাম্য
Synonym	সমার্থ শব্দ, প্রতিশব্দ
Syntax	বাক্যপ্রকরণ, পদবিন্যাস
Synthesis	সংশ্লেষ, সমন্বয়

T	
Terminology	পরিভাষা, পারিভাষিক শব্দ
Theism	আস্তিকতা, আস্তিকতাবাদ
Theory of Evolution	অভিব্যাক্তিবাদ
Title page	নাম-পত্র
Total Collector	পারানি-সংগ্রাহক
Transparency	স্বচ্ছতা
V	
Valency	যোজ্যতা
Velocity	বেগ
Vocational	বৃত্তীয়
W	
Welfare Centre	কল্যাণ-কেন্দ্র
X	
Xenophobia	বেদেশী-বিদ্বেষ, বিদেশী-বিরোধিতা

যে কোন চার (৪) টির পরিভাষা লিখুন **৪ X ২=৮**

Audio-visual aid, Broadcasting, Infrastructure, Nihi9lism, Pseudonym, Surrealism, Welfare centre.

NOTES

NOTES